১০০ ১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ৩য় সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ শ্রাবণ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ৬ শাওয়াল, ১৪৩৪ হিজরি | ১৫ জহুর, ১৩৯২ হি. শা. | ১৫ আগষ্ট, ২০১৩ ঈসাব্দ

এ সংখ্যায় রয়েছে

* হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) -এর প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবা
* হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) -এর প্রদত্ত জুমুআর খুতবা
* মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, জার্মানীর ২০১১ সালের বার্ষিক ইজতেমায় আতফালদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর বক্তৃতা।
* সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য
* রূপক-বর্ণনার অন্তরালে
* হযরত মুহাম্মদ (সা.)খাতামান্ নবীঈন কেন?
* ঈদ মুসলিম উম্মাহকে আনুগত্যের শিক্ষা দেয়
* ইসলাম ও মালী কুরবানী
* এক চরম বিদ্বেষীর সত্যের অকপট স্বীকারোক্তি
* হযরত ইউনুস (আ.)-এর ধর্মপ্রচার
* প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি

ঈদ মুবারাক

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

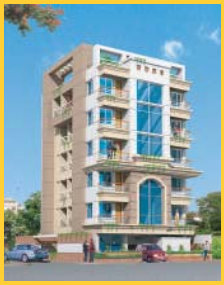

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

Member | REHAB

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

Veronica tours & travels

Travel Agent & Tour Operator

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
CEO

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier), Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola Jessore. Tel : 67284	Kanas Gari, Sherpur Road Bogra. Tel : 73315	205, Baizid Bostami Road Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

দুষ্কর্ম থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ- মহানবী (সা.)-এর সাথে গভীর ও নিবিড় প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক

"কুল ইন কানা আবাউকুম ওয়া আবনাউকুম ওয়া ইখওয়ানুকুম ওয়া আযওয়াজুকুম ওয়া আ'শিরাতুকুম ওয়া আমওয়ালুকৃতারাফ্‌তুমুহা ওয়া তেজারাতুন তাখ্‌শাওনা কাসাদাহা ওয়া মাসাকিনু তারযাওনাহা আহাব্বা ইলাইকুম মিনাল্লাহি ওয়া রাসুলিহী ওয়া জিহাদি ফি সাবিলিহী ফাতারাব্বাসু হাত্তা ইয়াতি ইয়াল্লাহু বিআমরিহী, ওয়াল্লাহু লা ইয়াহ্‌দিল কাওমাল ফাসেক্বীন" (সূরা তওবা : ২৪)।

[অর্থ: তুমি বল: তোমাদের পিতৃপুরুষ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের (অন্যান্য) আত্মীয়-স্বজন এবং তোমরা যে ধন-সম্পদ অর্জন কর ও যে ব্যবসা-বাণিজ্যে তোমরা মন্দার ভয় কর এবং তোমরা যে বাড়ী-ঘর পছন্দ কর, (এসব) যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জেহাদ করা থেকে তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে না আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর আর আল্লাহ্ দুষ্কর্মপরায়ণ লোকদের হেদায়াত দেন না।]

পথ-নির্দেশনামুলক পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ আর রাবে রাহেমাল্লাহু তা'লা বলেন-

হে মুহাম্মদ (সা.)! এ ঘোষণাটিও দিয়ে দাও, যদি তোমাদের পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি, ছেলে-মেয়ে ও ভবিষ্যত বংশধরেরা, তোমাদের ভাই-বেরাদর ও স্ত্রীরা, তোমাদের বংশ-গোত্র আর ওই সব সহায়-সম্পদ যা তোমরা পরিশ্রম করে উপার্জন করেছ আর সেই ব্যবসা-বাণিজ্য যে জন্য তোমরা চিন্তিত থাকো যে, পাছে না লোকসান বা ক্ষতি হয়, আর সেই গৃহ যাতে তোমরা আরাম-আয়েশে বসবাস কর অর্থাৎ সেই মহল যার কামরাগুলো তোমরা নিজেদের ইচ্ছা মাফিক বানিয়ে সুসজ্জিত করে রেখেছো। ***'আহাব্বা ইলাইকুম মিনাল্লাহে ওয়া রসূলিহি'*** তোমাদের কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে ওঠে আর খোদার রাস্তায় জিহাদ করা থেকেও প্রিয়তর হয়, ***'ফাতারাব্বাসু হাত্তা ইয়াতি ইয়াল্লাহু বিআমরিহী'*** তবে তোমরা অপেক্ষা কর যতক্ষণ আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত না আসে অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন সিদ্ধান্ত কার্যকর করে দিখিয়ে দেন যা দিয়ে তোমাদের 'প্রেম-ভালবাসা' মিথ্যা সাব্যস্ত হয়ে যায় আর খোদার প্রেম-ভালোবাসা পাওয়ার পরিবর্তে তাঁর অসন্তুষ্টির পাত্রে পরিণত হও। বর্ণিত হয়েছে- ***'ওয়াল্লাহু লা ইয়াহ্‌দিল কাওমাল ফাসেক্বীন'*** খোদা তা'লা দুষ্কর্মপরায়ণ লোকদের হেদায়াত দেন না।

কুরআন করীম, দুষ্কর্মের এমন সব পরিচয় প্রদান করেছে যা আপনারা দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে খুঁজে পাবেন না। সাধারণভাবে দুষ্কর্ম বলতে আমরা পাপ-কর্ম করা বা দৃশ্যমান অপসন্দনীয় কোন কর্ম করাকে বুঝে থাকি, কিন্তু কুরআন করীম দুষ্কর্মকে ভালোবাসার সাথে জুড়ে দিয়ে কপট-ভালোবাসাকে দুষ্কর্ম বলে চিহ্নিত করেছে। বর্ণিত হয়েছে, খোদার পর মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা বাধ্যতামুলক। পবিত্র এই সত্ত্বার সাথে ভালোবাসা না রাখলে তুমি দুষ্কর্মপরায়ণ।

প্রশ্ন ওঠে, প্রেম না করার সাথে দুষ্কর্মের সম্পর্কটা কি? সম্পর্কের এই বিষয়টি সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনকালের প্রতিটি মূহুর্তই কাটতো খোদা তা'লার সন্তুষ্টির অধীনে। কেননা খোদার সন্তুষ্টি বহির্ভূত যে কর্ম, তা-ই হচ্ছে দুষ্কর্ম। অতএব, কুরআন করীম দুষ্কর্মকে প্রেমের বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করেছে। তবে অসাধারণ বিষয়টি হলো, হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর জেহাদপূর্ণ জীবনের সাথে যদি ভালোবাসা গড়া না হয় অর্থাৎ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জীবন ভর যে জেহাদ করে দেখিয়েছেন তার মর্যাদাপূর্ণ কোন ঠাঁই যদি তোমার অন্তরে না থাকে তবে তুমি দুষ্কর্মকারীর মতই, আর যে স্থলেই তুমি ওই পবিত্র সুন্নত থেকে পিছপা হও, সেখানেই তুমি দুষ্কর্মে জড়িয়ে যাও আর আল্লাহ্ দুষ্কর্মপরায়ণদের হেদায়াত দান করেন না। (জুমুআর খুতবা, ৩ এপ্রিল ১৯৮৭)

মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা হৃদয়ে লালন করে জগতের প্রতিটি মানুষ হেদায়াতের সন্ধান লাভ করুক। লাভ করুক মহান স্রষ্টার নৈকট্য। ***"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদেও ওয়া বারেক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ"।***

সকলকে ঈদুল ফিতর-এর শুভেচ্ছা

'ঈদ মুবারক'

সূচিপত্র

১৫ আগষ্ট, ২০১৩

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর প্রদত্ত
ঈদুল ফিতরের খুতবা ৬

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর প্রদত্ত
জুমুআর খুতবা ১৩

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, জার্মানীর ২০১১ সালের বার্ষিক ইজতেমায় আতফালদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর বক্তৃতা। ১৮

সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য
আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক ২৩

রূপক-বর্ণনার অন্তরালে
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান ২৮

হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্ নবীঈন কেন?
খন্দকার আজমল হক ৩২

ঈদ মুসলিম উম্মাহকে আনুগত্যের শিক্ষা দেয়
মাহমুদ আহমদ সুমন ৩৫

ইসলাম ও মালী কুরবানী
মৌলবী মোজাফফর আহমদ রাজু ৩৮

এক চরম বিদ্বেষীর সত্যের অকপট স্বীকারোক্তি ৪২

হযরত ইউনুস (আ.)-এর ধর্মপ্রচার
সংকলন: মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান ৪৩

প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল ৪৫

সংবাদ ৪৭

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী ৪৮

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এক স্থানে বলেন-

"খোদাই আমার বেহেশ্‌ত। খোদাতেই আমার পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁর দর্শন লাভ করেছি আর সর্বপ্রকার সৌন্দর্য তাঁর মাঝে দেখতে পেয়েছি।"

পবিত্র রমযান শেষে নাযাতের দশকে এটাই হলো আসল প্রাপ্তি–এ কারণেই রমযান শেষে ঈদুল ফিতরের আনন্দ উৎসব।

কুরআন শরীফ

সূরা বাকারা-২

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ
هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ
اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا
كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪
ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ
وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

* ১৮৮। রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রী-গমন তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। তারা হলো তোমাদের পোশাক[২১২] এবং তোমরা হলে তাদের পোশাক। আল্লাহ্ জানেন নিশ্চয় তোমরা তোমাদের নিজেদের অধিকার খর্ব করছিলে। অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন এবং তোমাদের মার্জনা[২১৩] করলেন। অতএব এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হতে পার এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা নির্ধারিত করেছেন তা অবলম্বন কর। আর তোমরা খাও এবং পান কর যতক্ষণ তোমাদের কাছে ভোরের সাদা রেখা (রাতের) কালো রেখা থেকে সুস্পষ্ট না হয়। * অত:পর রাত[২১৪] (নেমে আসা) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে[২১৫] ই'তিকাফের অবস্থায় তাদের সাথে দৈহিকভাবে মিলিত হবে না। এসব আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা। অতএব এর ধারে কাছেও যেও না। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তারা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পারে।

২১২। কী চমৎকার একটি মাত্র বাক্যে কুরআন স্ত্রীলোকের অধিকার ও মর্যাদা বর্ণনা করেছে এবং বিয়ের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে তুলে ধরেছে। এ আয়াত বলছে, বিয়ের উদ্দেশ্য হলো দম্পতির শান্তিলাভ, আত্ম-সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্যবর্ধন। কেননা পোশাকের কাজও তা-ই (৭:২৭, ১৬:৮২)। বিয়ের উদ্দেশ্য কেবল কাম-বৃত্তি চরিতার্থ করা নয়। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে মন্দকাজ ও কুৎসা হতে রক্ষা করা, এর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

২১৩। 'আফাল্লাহু আন্হু' এর আরো অর্থ হলো আল্লাহ্ তার ভুল সংশোধন করে তার কাজ-কর্ম ঠিক করে দিলেন, আল্লাহ্ তাকে সম্মান দিলেন। অন্য এক অর্থ হলো, আল্লাহ্ তাকে উদ্ধার করলেন (মুহীত)।

* [প্রকৃতপক্ষে সাদা রেখা ফুটে ওঠা ভোর হওয়ার সাথে সম্পর্কিত]। অতএব, অর্থ হবে.....'যতক্ষণ তোমাদের কাছে ভোরের সাদা রেখা (রাতের) কালো রেখা থেকে সুস্পষ্ট না হয়'। (মওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)।

২১৪। যেসব দেশে দিন ও রাত অতিমাত্রায় দীর্ঘ (যেমন মেরু অঞ্চল), সেখানে দিন ও রাত ১২ ঘন্টা করে ধরতে হবে (মুসলিম, বাবু আশরাত আস্সায়াত)।

২১৫। 'ই'তিকাফ' এ থাকা অবস্থায় দিনে এবং রাতে স্ত্রী-গমন কিংবা এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য সব নিষিদ্ধ। কেননা রোযার আত্মিক সুফলকে পূর্ণতার দিকে পৌঁছানোর জন্য দিবা-রাত্র চেষ্টা সাধনা করার নামই 'ইতিকাফ'।

হাদীস শরীফ

প্রতারণা

কুরআন ঃ

নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে (সূরা রা'দ ঃ ১২)

হাদীসঃ

আন আবী হুরায়রাতা কুলা আন্না রসূলাল্লাহে (সা.) কুলা ইযা কুলার রসূলু হালাকান্‌নাসু ফাহুআ আহলাকাহুম (মুসলিম)। অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূললুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি অন্যদের সম্বন্ধে বলে, সে (বা তারা) ধ্বংস হয়ে গেল বস্তুতঃ সে ব্যক্তি এই কথা বলে তাকে (বা তাদেরকে) ধ্বংস করে দেয়। (অথবা লামের উপর পেশ দ্বারা পড়লে হবে সে নিজেই তার চাইতে বেশী ধ্বংসপ্রাপ্ত)।

ব্যাখ্যা ঃ

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার কথা বর্ণনা করে উত্তম জাতিতে পরিণত হবার পদ্ধতি বর্ণনা করছে।

মানুষের মধ্যে উন্নতির জন্যে সব কিছু রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ তার সঠিক ব্যবহার করে না। কেউ অহংকার অহমিকায় ভুগে, আবার কেউ হীনমন্যতায়। বস্তুতঃ এ পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে যা অনেকের মাঝে মিথ্যা অহংরূপে বিদ্যমান থাকে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে তা হলো, জাতির মাঝে, লোকদের মাঝে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও সৎ সাহসের সঞ্চার করতে হবে তবেই জাতি বা গোষ্ঠী উন্নতি করবে। এর পরিবর্তে যদি চেষ্টা না করে বলতে থাকে যে, ধ্বংস হয়ে গেল– অত্যন্ত হতাশার বহির্প্রকাশ করে। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বলেন, এভাবে বললে, তারা নিরুৎসাহিত হবে হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করবে। হযরত রসূল করীম (সা.) একবার এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা সেখান থেকে পরাস্ত হয়ে মদীনায় আসলেন। ইসলামে পলায়ন করা হারাম আর আমরা পলায়ন করেছি তারা এই ভেবে তারা লজ্জায়-শরমে হুযূর (সা.)-এর সামনে আসতেন না। এক সময় হুযূর (সা.) তাদেরকে মসজিদের এক কোণায় মুখ লুকিলে বসে থাকতে দেখলেন। হুযূর (সা.) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? লজ্জায় তারা মাথা নীচু করে বল্লেন, আমরা পলায়নকারী। তিনি (সা.) তাদের অবস্থা আঁচ করে বল্লেন, তোমরা পলায়নকারী নও। তোমরা শক্তি অর্জন করে আক্রমণের জন্যে পিছিয়ে এসেছো। তোমরা অন্য কারো কাছে যাওনি বরং আমার কাছে এসেছো। আমি তোমাদের নেতা হয়ে আবার তোমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাবো।

সুবহানাল্লাহ্! কতই না উত্তম এ আচরণ আর কত উত্তমই না এই শিক্ষা! তিনি (সা.) সাহাবাদের মনের অবস্থা আঁচ করে কত সুন্দর কথায় মন্তব্য করলেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাবো কীভাবে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হচ্ছি আমরা আর কীভাবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত করছি।

কুরআান এবং হাদীস বলে, এরূপ ব্যধিগ্রস্তরা কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না বরং ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন সর্বদা সতেজ মনের অধিকারী হই। মৃত্যুর আগেই যেন মনের দিক হতে মৃত্যুবরণ না করি, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

ঈসা ইবনে মরিয়ম কখনও আকাশ থেকে অবতরণ করবেন না

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"এখন দেখ, খোদা স্বীয় হুজ্জত (দলীল প্রমাণের সাহায্যে কোন কিছুর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা–অনুবাদক) তোমাদের ওপর এভাবে পূর্ণ করে দিয়েছেন যে, আমার দাবীর অনুকূলে হাজার হাজার দলীল-প্রমাণ কায়েম করে তোমাদেরকে এ সুযোগ দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা চিন্তা কর যে, যে ব্যক্তি তোমাদেরকে এ জামাআতের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি কোন পর্যায়ের তত্ত্বজ্ঞানী এবং কী পরিমাণ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তোমরা আমার পূর্বের জীবনের ওপর কোন দোষারোপ করতে কিংবা মিথ্যা বা প্রতারণার অভিযোগ আনতে পারবে না, যাতে তোমরা এ ধারণা করতে পার যে, যে ব্যক্তি পূর্ব থেকেই মিথ্যা ও প্রতারণায় অভ্যস্ত, সে এটাও মিথ্যাই বলছে। তোমাদের মাঝে কে আছে , যে আমার ওপর দোষারোপ করতে পার? সুতরাং এটা খোদার ফযল যে, তিনি শুরু থেকেই আমাকে তাকওয়ার (খাদা-ভীতির) ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। যারা চিন্তা করে তাদের জন্য এটা একটি দলীল।

এছাড়াও আমার খোদা শতাব্দীর ঠিক শিরোভাগে আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে সত্যবাদী মানাতে যে পরিমাণ দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন ছিল এর সবটাই তোমাদের জন্য যোগান দিয়েছেন। আমার জন্য আকাশ থেকে আরম্ভ করে পৃথিবী পর্যন্ত নিদর্শন প্রকাশ করেছেন এবং সকল নবী আদি থেকে অদ্যাবধি আমার সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং বিষয়টি যদি মানুষের নাগালে হত তাহলে এতে এত বিপুল পরিমাণ দলীল-প্রমাণ কখনো একত্র হ'ত না।'

'স্মরণ রেখ, আকাশ থেকে কেউ অবতীর্ণ হবে না। আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদী, যারা আজ জীবিত আছে, তারা সকলে মরবে, কিন্তু তাদের মাঝ থেকে কেউ মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। অতঃপর তাদের সন্তানেরাও মরবে, কিন্তু তাদের মাঝ থেকেও কেউ মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে না।

অতঃপর সন্তানদের সন্তানেরা মরবে, কিন্তু তারাও মরিয়মের পুত্রকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। তখন খোদা তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবেন যে, ক্রুশের প্রাধান্যের যুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে এবং পৃথিবীর অবস্থা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে; কিন্তু মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.) এখনও আকাশ থেকে অবতীর্ণ হলেন না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। অতঃপর আজ থেকে তৃতীয় শতাব্দী পার হবে না, যখন ঈসা (আ.)-এর অপেক্ষাকারীরা কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সবাই অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হয়ে এ মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে, পৃথিবীতে তখন একটিই ধর্ম হবে এবং একই নেতা। আমি তো একটি বীজ বপন করতে এসেছি। সুতরাং আমার হাত দ্বারা সে বীজ বপন করা হয়েছে এখন এটা বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিকশিত হবে। কেউ একে প্রতিহত করতে পারবে না।"

(তাযকিরাতুশ্ শাহাদাতায়েন, পৃঃ ৯৬, ১০০-১০১, বাংলা সংস্করণ)

ঈদুল ফিতরের খুতবা

এ ঈদ খোদা তা'লার অগণিত বরকত নিয়ে আগমন করুক

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২০ আগষ্ট ২০১২-এর ঈদুল ফিতরের খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

ان الذين قالوا ربنا اللّٰه ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة الا تخافوا ولا تحزنو وابشروا بالجنة التى كنتم توعدونoنحن اوليؤكم فى الحيوة الدنيا و فى الاخرة ولكم فيها ما تشتهى انفسكم ولكم فيها ما تدعوننزلا من غفور رحيمo

"ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মাসতাক্বামূ তাতানাযযালু আলাইহিমুল মালাইকাতু আল লা তাখাফূ ওয়া লা তাহযানূ ওয়া আবশিরু বিল জান্নাতিল্লাতি কুনতুম তুআদূন। নাহনু আউলিয়াউকুম ফিল হায়াতিদ দুনইয়া ওয়া ফিল আখিরাতি, ওয়া লাকুম ফিহা মা তাশতাহয়ি আনফুসুকুম ওয়া লাকুম ফিহা মা তাদ্দাউন, নুযুলাম মিন গাফুরির রাহিম।" (সূরা:হামীম আস্ সাজদা: ৩১-৩৩)

উপরোক্ত আয়াতের অনুবাদ হল : ঐ লোকেরা যারা বলেছে আল্লাহ্ আমাদের প্রভূ, এরপর অবিচল থেকেছে, তাদের ওপর বহু ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় এবং তারা বলে তোমরা ভীত হয়ো না এবং দূ:খিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সে জান্নাতে তোমরা আনন্দে বসবাস করো। আমরা এ পার্থিব জগতে তোমাদের সাথে আছি এবং পরকালেও তোমাদের সাথে আছি। আর সেখানে তোমাদের জন্য ঐ সব কিছু থাকবে যা তোমাদের হৃদয় আকাঙক্ষা করে আর সেখানে তোমরা যা চাইবে তা পাবে। এটি তোমাদের জন্য অশেষ ক্ষমাশীল ও বার বার দয়াকারী খোদার পক্ষ থেকে মেহমানদারী স্বরূপ।

আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রকৃতি এমন বানিয়েছেন যে, মানুষ আনন্দ-খুশি অন্বেষণ করে। আর চেষ্টা করে যেন তাদের দূঃখ দূর হয়ে যায় আর এ জন্য বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে থাকে। জগৎ লাভের উদ্দ্যেশে এবং জাগতিক সুযোগ সুবিধার লক্ষ্যে প্রত্যেক মানুষ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে। তার এ প্রচেষ্টার ফলে জাগতিক যে সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে তা তার নিজের জন্য, তার পরিবারের জন্য, তার স্ত্রী-সন্তানদের আনন্দের কারণ হবে। তার দূঃখ- দুর্দশা দূর হবে। অতএব এটি লাভ করার জন্য মানুষ পরিশ্রম করে এবং চেষ্টাও করে। যাদের পরিশ্রম করার অভ্যাস নেই অথচ আশা করে যে, আমরা ঘরে বসে থেকেই জাগতিক কল্যাণসমূহ পেয়ে লাভবান হবো, তারা অপরের উন্নতি এবং আনন্দ দেখে কেবল ঈর্ষান্বিত হয়। এটি ভিন্ন বিষয় যে, অনেকের আনন্দ করার উপলক্ষ্য লাভ হয় না।

এটি তাদের বিষয়, কিন্তু এ জগত তো এমন-ই অর্থাৎ এটি জগতের নীতি যে, পরিশ্রম করলে ফল লাভ হয় এবং মানুষ উক্ত খুশি অর্জন করতে সক্ষম হয়। জাগতিক আনন্দ লাভের আরো একটি দৃশ্য হল, মানুষ চায় যে, তার পরিশ্রমে এতটা ফল লাভ হোক যতটা সে আশা করে তবেই সে আনন্দিত হতে পারবে। পার্থিবতায় মগ্ন ব্যক্তি তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নিজ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা না দেখলে নিরাশ হয়ে যায়। অথচ মু'মিনের ব্যক্তিত্ব এমন যে, সর্ববস্থায় সে কৃতজ্ঞ বান্দা থাকার চেষ্টা করে। অনেক লোকের অভ্যাস হল, অবস্থা যাই হোক, আল্লাহ্ তা'লার কৃপাও যদি লাভ হয় তবুও তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না এবং আনন্দিতও হয় না। সর্বদাই তারা নিরাশ থাকে এবং তাদের মাথায় দুশ্চিন্তা ছেয়ে থাকে।

কোন একজন আমাকে বলেছেন, আমার একজন কর্মচারী ছিল, প্রতি বছরই যে নিজ আয়-উপার্জনে নিরাশা প্রকাশ করতো। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, সে কখনোই খুশি হবেনা এবং খোদা তা'লার শুকরিয়া আদায় করবে না এবং সর্বদাই বলতো যে, আমার লোকসান হয়েছে। আমি যখনই তাকে বলতাম যে হিসাব করো। হিসাব করে দেখা যেত তার লাভ হয়েছে, আর যখন তাকে বলা হত এত লাভ হয়েছে, লোকসান কীভাবে হল? তখন উত্তরে সে বলতো, আমি আমার ফসল থেকে ১৫ লক্ষ রুপি মুনাফা আশা করেছিলাম। অথচ আমার মাত্র ১০ লক্ষ রুপি লাভ হয়েছে, ৫ল লক্ষ রুপি লোকসান হয়ে গেলো। মানুষ এমনও হয়!

এরপর জগতে এমন লোকও আছে যাদের অনন্দ পালন করার পদ্ধতি ভিন্ন ধরনের। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তারা মিতব্যয়ী নয়। ফলে তারা আনন্দিত হতে পারে না। যেভাবে ঐ ব্যক্তির উপমা আমি দিয়েছি। তাদের পারিবারিক শান্তি লাভ হয় না। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও ঘরে শান্তি নেই, স্ত্রীদের সাথে ভাল সম্পর্ক নেই, সন্তানদের কারনে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। পশ্চিমা বিশ্বে অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে অবস্থা এমনি। আরো অনেক ধরনের দুশ্চিন্তা আছে যার ফলে তারা বিচলিত হন।

তাই তারা এর একটি সমাধান পেয়েছেন আর তা হল, বিভিন্ন ধরনের বিলাসীতাকে নিজেদের আনন্দ বানিয়ে নিয়েছেন। যাদের ঘরে শান্তি নেই তারাও, এবং ইন্দ্রিয়সুখে যারা নিমগ্ন তারাও আনন্দিত হবার লক্ষ্যে (এ দেশে মদ একটি সাধারণ ব্যপার) তারা মদে আসক্ত হয়ে পড়ে যেন এর মাধ্যমে তাদের আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। এছাড়া গান-বাজনা, নাচ, মুখোশধারীদের অংশ গ্রহণে এক অনুষ্ঠান বিশেষ, এগুলো দুঃখ দূর করার জন্য এবং আনন্দের বহির্প্রকাশের জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

আর এ সব আনন্দ পালনের পদ্ধতি হোক অথবা আনন্দ লাভের মাধ্যম এবং দুঃখ দূর করার উদ্দেশ্যেই হোক, বাহ্যিক ও জাগতিক উদ্দেশ্য লাভের মাধ্যমে বা চিৎকার-চেঁচামেচির মাধ্যমে, অথবা নাচ-গানের মাহফিলে অথবা মদ্যপানের মাধ্যমে অথবা বিকৃত কর্মকান্ডের মাধ্যমে এগুলো করা হয়, যদিও এ সবকিছু হালকা এবং জাগতিক বিষয়ই বটে।

এ লোকেরা মদে এতই মাতোয়ারা থাকে যে, প্রত্যেক কোনে কোনে (অর্থাৎ অলিতে-গলিতে) মদের দোকান দেখা যায়। এটা জানা সত্ত্বেও যে, মদ্যপান ক্ষতিকারক। মদের দোকান ছাড়াও অধিকাংশ দোকানে এবং রেস্টুরেন্টগুলোতে মদ পাওয়া যায়। আমি পুর্বেও বলেছি, তারা জানে যে, মদ্যপানে ক্ষতি হয়। এ ব্যপারে বিভিন্ন আর্টিকেলও পত্রিকায় ছাপাতে দেখা যায় আর এ কারণে তারা নির্দিষ্ট একটি বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদেরকে এবং শিশুদেরকে মদ্যপান নিষিদ্ধ করে রেখেছে। মদ যদি এতটাই নির্দিষ্টকর না হয়ে থাকে এবং মস্তিষ্কের জন্য শান্তিদানকারী জিনিসই হয়ে থাকে, তবে নির্দিষ্ট একটি বয়স পর্যন্ত এটি নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে কেন?

এরপর মদ কেবল দু:খ দূর করার উদ্দেশ্যেই পান করা হয় না বরং এটি আনন্দের বহির্প্রকাশের উদ্দেশ্যেও এখানে ব্যবহার করা হয়। যদি কোথাও আনন্দের বহির্প্রকাশ করতে হয়, খেলায় যদি কোন টিম বিজয়ী হয় অথবা অন্য কোন ফাংশন যদি হয় তবে সূযোগ হলে সেখানে মদের বোতল ঝাঁকিয়ে পরস্পরের গায়ে মদ ছিটানো হয়। মদের বোতল যদি খুব জোরে ঝাঁকানো হয় তখন গ্যাস থাকার কারনে ফোয়ারার ন্যায় মদ বোতল থেকে বাইরে ছুঁটে আসে আর এ দিয়ে তারা গোশলও করে ফেলে।

এটিও এক ধরনের আনন্দের বহির্প্রকাশ। জানিনা কেন এর গন্ধে তাদের নাকে কোন সমস্যা হয় না! আমার মনে আছে একবার আমি একটি স্টোরে গিয়েছিলাম। সেখানে সাজানো মদের বোতল থেকে একটি কেস পড়ে যায় এবং কিছু বোতল ভেঙেও যায় ফলে মদ ছড়িয়ে পড়ে আর এর উৎকট গন্ধ এতটাই প্রকট ছিল যে, দাঁড়ানোই দায় হয়ে উঠল! মোটকথা তারা আনন্দের বহির্প্রকাশ হিসেবে একে অপরের শরীরে মদও ছিটায় আর এহেন কর্মের ফলে তারা এমন ভাবে উচ্ছসিত হয় যে, তারা যেন দোজাহানের নেয়ামতসমূহ লাভ করেছে।

এমনিভাবে আনন্দের বহির্প্রকাশের জন্য, জাগতিক লোকদের মাঝে খেলাধুলাও অন্তর্ভূক্ত।

আমাদের ঈদ তখন-ই প্রকৃত ঈদ হবে, আমাদের রোযা এবং রমযান তখন-ই চিরস্থায়ী কল্যাণ হিসেবে প্রবহমান থাকবে যখন আমাদের মাঝে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা অথবা ঐ সকল লোক যারা এসব দেশে স্বাচ্ছন্দে আছেন তারা নিজ গরিব ভাইদের প্রতি খেয়াল রাখবেন।

আর আনন্দের এ বহির্প্রকাশে, মহিলা-পুরুষে এতটা মাখামাখি আর এমন সব দিগম্বর পোষাক পরে এগুলো করা হয় যে, কোন ভদ্র ও শালীন ব্যক্তি এটি দেখতেই পারে না। জনসমক্ষে এরূপ করা কালে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে তা সম্প্রচার করা হয়। গত কয়েকদিন পূর্বে এখানে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহরেও এবং দেশেও এমনকি সমস্ত পৃথিবীতে এটি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলেছে। হাজার হাজার লোক হয়তো এটি দেখেছে বরং লক্ষ লক্ষ লোক এটি দেখেছে আর টেলিভিশনে হয়তো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক এটি দেখে থাকবে। কয়েকটি টিভি চ্যানেল চব্বিশ ঘন্টা এ দৃশ্য দেখানোর জন্য নিবেদিত ছিল। জগতের সমস্ত টিভি চ্যানেল অন্ততপক্ষে খবরের মাঝে এ প্রোগ্রাম অবশ্যই কিছু না কিছু দেখিয়েছে।

প্রারম্ভে এবং সমাপ্তিতে এমন শো দেখানো হয়েছে যেখানে আনন্দের বহির্প্রকাশ দেখাতে নির্লজ্জতাও ছিল। আনন্দের বহির্প্রকাশ কমই ছিল আর নির্লজ্জতাই ছিল বেশি। শেষ দিনে তো নাচ-গানে অর্থাৎ নারী-পুরুষের গান এবং শো-তে এমন কার্যক্রম ছিল যা হৃদয়ে অস্থিরতার মন্দ বহির্প্রকাশ ঘটানো ছাড়া আর কিছুই না। এটি এক মিনিটের বেশি কেউ দেখতেই পারে না, কেননা কোন না কোন বাজে দৃশ্য চলেই আসছিল অথচ এটিই তাদের আনন্দের বহির্প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে এটি আনন্দের বহির্প্রকাশ নয়, বরং কলাকৌশলের নামে হৃদয়ের অস্থিরতা আর স্থূলতার বহির্প্রকাশ মাত্র। টেলিভিশনে লক্ষ লক্ষ বরং কোটি কোটি দর্শক এটি দেখে থাকবে। অনেক যুবক এতে প্রভাবান্বিত হয়ে বলে, খুব ভাল কলাকৌশল দেখানো হচ্ছে। অথচ এটি কোন কলাকৌশল নয় বরং এটি হৃদয়ের অস্থিরতা। প্রত্যেকটি গানের শো-এর জন্য লক্ষ লক্ষ পাউন্ড হয়তো খরচ করা হয়েছে আর আমি শুনেছি এমন কয়েকটি শো হয়েছে।

মোটকথা, এহেন আনন্দ সহকারে অলিম্পিক শেষ হয়েছে। ইউ কে-এর টিমও এ অলিম্পিকে অংশ নিয়েছে এবং তারা বিভিন্ন ইভেন্টস্-এ পদকও জিতেছে আর এই আনন্দের বহির্প্রকাশের জন্য শহরে তারা একটি উৎসব করতে যাচ্ছে। অতএব লন্ডনের পথে আবারও চিঁৎকার চেঁচামেচি এবং মদ্যপানের উৎসব হবে।

এই হল তাদের আনন্দের বহির্প্রকাশ আর অনেক গবেষক এটি গবেষণা করা শুরু করে দিয়েছে এবং পত্র-পত্রিকায়ও এসেছে যে, অলিম্পিক এখন আর খেলাধুলার জন্য অনুষ্ঠিত হয় না বরং এখন অলিম্পিকের নামে আয়োজক কমিটি এটিকে আয়ের একটি মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে এবং কোটি কোটি পাউন্ড তারা এর মাধ্যমে আয় করে চলেছে। মোটকথা জগতে আনন্দের বহির্প্রকাশের লক্ষ্যে অথবা আনন্দ লাভের বিভিন্ন মাধ্যম আছে যার ওপর জগত আমল করে কিন্তু এ সকল আনন্দ যা জাগতিক আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় অথবা পালন করা হয়, এসবই কেবল জাগতিক আনন্দ। অবশেষে কিছু সময় পর অবশ্যই এ সব আনন্দ নিঃশেষ হয়ে যায় বটে কিন্তু অস্থিরতা পুণরায় শুরু হয়ে যায়। দুঃখ দূর করার পথ খুঁজতে রয়েছে বিভিন্ন ধরণ, যেমন মদ্যপান বা জুয়া খেলা, যা স্বাস্থ্য বরবাদ করে দেয় এবং মানুষকে নিঃস্ব করে ছাড়ে।

অন্য দিকে আমরা মানুষের প্রকৃতির মাঝে এটি দেখতে পাই যে, মানুষ আনন্দ লাভ করতে চায় এবং দুঃখ দূর করতে চায়, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে চায়। খোদা তা'লাও মু'মিনের জন্য আনন্দের উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন আর যে উপলক্ষ্য সৃষ্টি করেছেন সে ব্যাপারে এটা দাবি করে বলা যায় যে, এটি স্থায়ী আনন্দ এবং ইহকাল ও পরকাল পরিশুদ্ধকারী। বলেছেন, আনন্দের উপলক্ষ্য সৃষ্টি কর এর ওপর আমল করার চেষ্টা যদি করো, তবে না কেবল এ জগতের আনন্দ লাভ হবে বরং পরকালের আনন্দ থেকেও অংশ লাভ করবে। সেই সকল মাধ্যমসমূহ যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা আনন্দ সৃষ্টির উপলক্ষ্য সৃষ্টি করতে বলেছেন তার মাঝে একটি হল রমযানুল মুবারকের মাস। যেখানে রোযার সাথে সাথে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৈধ খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে ইবাদতের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং অন্যান্য পুণ্যকর্মসমূহও সম্পাদন করতে হবে।

এখন দেখুন জাগতিক লোকেরা খাবার-দাবারের সাথে মদ্যপান করে, যার ফলে স্বাস্থ্যও ধ্বংস হয় এবং চরিত্রও স্খলিত হয়। এর দ্বারা তারা আনন্দ অন্বেষণ করে অথচ মু'মিন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ

প্রত্যেক সামর্থ্যবান আহমদীকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ কুরবানীর প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন এবং জামাতী ভাবে যেসকল সাহায্য প্রকল্প আছে সেখানে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক যেন প্রকৃত আনন্দ লাভ হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ হয়।

করার উদ্দেশ্যে বৈধ জিনিস খাওয়া থেকেও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেকে বঞ্চিত রাখছে এবং এর ফলে সে সুখ অনুভব করছে। আল্লাহ্ তা'লা যিনি সকল কর্মের প্রতিদান দিয়ে থাকেন তিনি নিজ বান্দাকে বলেন, তুমি যেহেতু আমার উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করেছ আর আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একটি মাস ব্যয় করেছ, আমার সন্তুষ্টি লাভ করার লক্ষ্যে তুমি তোমার খাবার-দাবারের আনন্দ বিসর্জন দিয়েছ অতএব ঐ প্রত্যেকটি রোযার প্রতিদানে আমি স্বয়ং তো রয়েছি, আজ ঈদের দিনেও তোমরা একত্রিত হয়ে সেই আনন্দের বহির্প্রকাশ করো, সকলে মিলে আনন্দ করো, ঘরে ঘরে আনন্দ করো, নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দ করো।

এখন বেশ গরম পড়েছে। এখানে গরম এত যে, বিগত দিনগুলোতে উনত্রিশ-ত্রিশ ডিগ্রী পর্যন্ত গরম পড়েছে আর এতেই লোকেরা 'উহ্! কী গরম' রব তুলছিল অথচ পাকিস্তান আরো বেশি গরমের দেশ এবং সেখানের তাপমাত্রা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে যায়। পাকিস্তানের রোযাদারদের অবস্থা কী হয় ভাবুন! এমনকি তাদের তেমন স্বাচ্ছন্দও নেই। পাকিস্তানে বিশেষ করে সতের-আঠারো ঘন্টা বিদ্যুৎও থাকে না। ঠান্ডা পানি আর পাখার বাতাসের জন্য লোকেরা হাহাকার করে, রোযার সময় তাদের অবস্থা কীরূপ হয় চিন্তা করুন! এছাড়া পাকিস্তানের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা যাকে ওয়াপদা বলা হয়, রাবওয়াবাসীদের প্রতি তাদের অনুগ্রহ হল, আমি শুনেছি, সেহেরী এবং ইফতারির সময় ২ ঘন্টা বিদ্যুৎ বন্ধ থাকে। এমতাবস্থায় জানিনা বেচারা গরিবরা সেহেরী এবং ইফতার কিভাবে তৈরি করে অথবা কী করে? কিন্তু মোটকথা, রোযা রাখে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রোযা রাখে যেন স্থায়ী সুখ লাভ করতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লাও যখন তার উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগীদের আমল দেখেন, তখন রোযার পর আনন্দোৎসব করার জন্য ঈদের দিন নির্ধারণ করেছেন, এ কথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। এখন যে অবস্থায় এরা রোযা রাখছে অর্থাৎ বিশেষভাবে পাকিস্তানের যে অবস্থার কথা আমি উল্লেখ করেছি, আর এমনি ভাবে তাদের জন্যও ঈদের দিন আসবে, বিদ্যুৎ পানি বিহীন আবার গরমও আছে। তারা ঈদের আনন্দ কীভাবে করবে কিন্তু এতদসত্ত্বেও ঈদের আনন্দোৎসব তারা করেছে এবং করছে, আজ সেখানেও ঈদ এবং লোকেরা আনন্দিত। এ অবস্থা বিশেষ করে পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত কিন্তু এতেও আমি যেভাবে পূর্বে বলে এসেছি যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং কোন ধরনের অভিযোগ মুখে উচ্চারণ করা ব্যতিরেকে এ সকল লোক ঈদ উদযাপন করছে, পৃথিবীর অন্যান্য যেসব দেশ আছে সেখানের তুলনায় আপনারা অর্থাৎ এখানে যারা আছেন, আপনাদের অবস্থা তো সেরূপ নয়। আপনারাও আজ ঈদ উদযাপন করছেন এবং আপনারা আনন্দিত যে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এক মাস কুরবানী করেছেন আর আল্লাহ্ তা'লা আজ এর প্রতিদান দিচ্ছেন এবং আজকের ঈদও তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

তাই আজকের ঈদও ঐ সকল লোকের জন্য যারা রমযানে রোযা রেখেছে এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করেছে। আর যারা এ রমযান, জাগতিক লোকদের ন্যায় কোন ধরনের ইবাদতের দিকে মনোযোগ না দিয়ে কাটিয়েছে, অথবা কোন নেকী না করে (অতিক্রম করেছে) তাদের ঈদ তো সেই ঈদ নয় যে ঈদ খোদা তা'লা এক মু'মিনের কাছে আশা করেন অথবা যে ঈদের সুযোগ আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনকে দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা ঈদের এ সুযোগ দান করে নিঃসন্দেহে ঐ সকল বাধ্য-বাধকতা যা খাবার দাবারের ব্যাপারে ছিল তা উঠিয়ে নিয়েছেন কিন্তু জাগতিক লোকদের ন্যায় যারা হা-হুতাশ করে তাদের ন্যায় চিঁৎকার-চেঁচামেচি এবং মদ্যপানের অনুমতি দেন নি। বরং বলেছেন, এ আনন্দকে প্রকৃত আনন্দে পরিনত করার লক্ষ্যে ঐ সকল অধিকার আদায় করার অঙ্গীকার করো যা তোমাদের প্রতি অর্পিত। খোদা তা'লার অধিকার আদায়ের যে অভিজ্ঞতা তোমরা রমযানে লাভ করেছ, তা-ও এ ঈদের আনন্দের সাথে মিলিয়ে প্রবাহমান রাখার অঙ্গীকার করো এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। আর বান্দার অধিকার আদায়ের প্রতি তোমাদের যে মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছে, তা-ও এ ঈদের আনন্দের সাথে মিলিয়ে প্রবাহমান রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও এবং অঙ্গীকার করো এবং সর্বদা স্মরণ রাখবে যে, প্রকৃত জীবন হল পরকালের জীবন।

এ জগতের আনন্দ পরকালে মু'মিন যে আনন্দ লাভ করবে তার এক ঝলক মাত্র।

তাই প্রত্যেক মু'মিনের ঐ স্থায়ী আনন্দ অন্বেষণ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ঐ মান তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন সর্বদা-প্রতিটি মুহূর্তে তোমাদের সামনে ***"রাব্বুনাল্লাহ"*** কথাটি থাকবে অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের প্রভূ। খোদা তা'লার তত্ত্বজ্ঞান এবং খোদার পরিচয় এবং তাঁকে পরিবেষ্টন করে থাকা এবং তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া তখনি সম্ভব হবে যখন সর্বদা এ কথাটি মনে রাখবে। যখন এ কথার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হবে তখন খোদার তত্ত্বজ্ঞানও লাভ হবে। আর যখন অবস্থা এমন হবে তখন জগতের আনন্দ লাভ করা কারো উদ্দেশ্য থাকে না বরং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে যায়। জাগতিক হা-হুতাশ, চিঁৎকার-চেঁচামেচি, মদ্যপান লাফালাফি উদ্দেশ্য থাকে না। আনন্দের নামে বাজে কাজ এবং বৃথা কার্যকলাপ উদ্দেশ্য থাকে না। রঙিন আলোকসজ্জা করে নাচ-গান করা তার উদ্দেশ্য থাকে না বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন এবং এর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা তার মূল উদ্দেশ্য হয়। ঐ উদ্দেশ্য লাভের জন্য প্রত্যেক মু'মিন রমযান মাস জুড়ে সাধানা করে এবং তা লাভের উদ্দেশ্যে উনত্রিশ বা ত্রিশ দিন রোযা রাখে। প্রত্যেক বৈধ কর্ম থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেকে বিরত রাখে। তাহাজ্জুদ

এবং অন্যান্য নফলসমূহ এবং যিকরে এলাহীর (খোদা তা'লাকে স্মরণের) দিকে মনোযোগ রাখে এবং খোদার পথে খরচ করার প্রতি মনোযোগ থাকে। সদকা-খয়রাতের দিকে মনোযোগ থাকে। ইবাদতে একাগ্রতা প্রদানের চেষ্টা করে।

মসজিদে এসে বাজামাত নামায আদায় করার প্রতি এতটাই মনোযোগ রাখে যে স্থান সঙ্কুলানে মসজিদ সংকীর্ণ হয়ে যায়। সকল গুণসমৃদ্ধ মহান সত্ত্বা খোদা তা'লার গুণাবলী সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করে। সর্বদা প্রচেষ্টা চালায় যে, এ সকল মনোযোগের সমষ্টির মাধ্যমে কীভাবে খোদা তা'লার রঙে রঙিন হওয়া যায়। প্রত্যেকে যখন এ প্রচেষ্টায় রত ছিল তখন দুর্বল থেকে দুর্বলতর লোকেরাও এ দিকে মনোযোগী হয়েছে। এ প্রচেষ্টাই থেকেছে অথবা এ মনোবাসনা প্রকট হয়েছে যে, খোদা তা'লার গুণগুলো ধারণ করার আদেশের ওপর কীভাবে আমল করা যায়? এরপর এ দিকে মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছে এবং এর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং এ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে যে, যদি এর কল্যাণ অন্যদের মাঝে পৌঁছে দেয়া না যায় তবে এ গুণগুলো ধারণ করার মাঝে কী উপকার সাধিত হবে?

অতএব এর দ্বারা বান্দার অধিকার আদায়ের নতুন নতুন পথ উম্মোচিত করার দিকেও পথনির্দেশ লাভ হয়েছে। এ চিন্তা অনেকের মাঝে আছে যে, খোদা তা'লার একটি গুন হল রবুবিয়্যাত (অর্থাৎ প্রতিপালন করা) এবং আমরা এ গুণে কীভাবে গুনান্বিত হতে পারি? তখন মনে হল, নিজ সন্তানদের খোঁজখবর নেয়া এবং লালন-পালন ছাড়া এতিমদের খোঁজ-খবর নেয়ার দিকেও মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এটিও কুরআন করীমে খোদা তা'লার গুরুত্বপূর্ণ আদেশাবলীর মাঝে একটি আদেশ। যদি আমরা আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যাতের স্বীকারকারী হই, এবং তার প্রতিপালন আশা করি এবং তা লাভ করি আর সামনে অগ্রসর হই তখন এ চেষ্টা থাকে যে, রমযান মাসে নি:স্বার্থভাবে অপরের কল্যাণেও কিছু করা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি দয়ার আচরণ করার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। খোদা তা'লার অনুগ্রহের প্রতি যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তবে রোযা এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশের কারনে মনে হবে যে, আমারও অন্যদের প্রতি অনুগ্রহ করা প্রয়োজন। ন্যায় পরায়নতার চেয়ে অগ্রসর হয়ে অনুগ্রহের দিকে ধাবমান হওয়া প্রয়োজন যেন আল্লাহ্ তা'লার কল্যানসমূহের উত্তরাধিকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা যদি স্বাচ্ছ্যন্দ দিয়ে থাকেন তবে রমযানে রোযার কারনে এ দিকেও মনোযোগ আকর্ষিত হবে যে, এমন বহু লোক আছে যারা হয়তো ভাল ইফতার পায় না তাদেরকে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করি যা তাদের খাবারের কাজে আসবে (অর্থাৎ খেতে পারবে)। এক দিকে ইফতারি করানোর পুন্য লাভ হলো আর অন্য দিকে বিশেষভাবে দরিদ্র দেশগুলোতে গরিবের প্রয়োজন পূর্ণ হলো। এখন সবকিছুর মুল্য চড়া, তাই খাবারেও সাহায্য হবে এবং 'গরিবের খোঁজ-খবর নাও' খোদা তা'লার এ আদেশও পালন হয়ে যাবে।

পাকিস্তানের কেউ একজন আমাকে বলেছে, আমি রমযানের চৌদ্দতম দিনে অথবা পনেরতম দিনে একজনকে কিছু খেজুর পাঠিয়েছি। (পাকিস্তানে এখন দ্রব্যমুল্য অনেক বেড়ে গেছে) তাকে খেজুর পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল ইফতার করানোর নেকী যেন লাভ হয় অর্থাৎ কাউকে ইফতার করাচ্ছি। কিন্তু যাকে খেজুর পাঠানো হয়েছে, সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে লিখেছে, 'আজ পনের রোযা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং আমরা পরিবারের সকলে নিয়মিত রোযা রাখছি। আজ আপনার পক্ষ থেকে খেজুর পেয়েছি এবং আমরা এ রমযানে আজই প্রথম খেজুর খেলাম। বাচ্চারা আজ খুব আনন্দের সাথে ইফতার করেছে। দেখুন! এমন লোকও আছে।

তাই রমযান যখন পুণ্যের আবহের কারণে খোদা তা'লার কৃপা এবং দয়ার দিকে মনোযোগ সৃষ্টি করেছে সেক্ষেত্রে গরিবদের প্রতিও মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমাদের ঈদ তখন-ই প্রকৃত ঈদ হবে, আমাদের রোযা এবং রমযান তখন-ই চিরস্থায়ী কল্যাণ হিসেবে প্রবহমান থাকবে যখন আমাদের মাঝে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা অথবা ঐ সকল লোক যারা এসব দেশে স্বাচ্ছ্যন্দে আছেন তারা নিজ গরিব ভাইদের প্রতি খেয়াল রাখবেন কেননা এখানে খোদা তা'লার কৃপায় খাবার-দাবারের অভাব নেই। ঐ নেকীসমূহ কেবল রমযান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করবে না বরং স্থায়ী কর্ম হিসেবে তা বহমান রাখার চেষ্টা করবে।

খোদা তা'লার কৃপা এবং এহসানসমূহ স্মরণ করে পরবর্তীতেও তা মনে রাখবে। নিজের সম্পদ, নিজের স্বচ্ছলতার সঠিক ব্যবহার করে গরীবদের প্রতিও মনোযোগী হবে। জাগতিক লোকদের ন্যায় কেবল নিজের খুশি লাভের উদ্দেশ্যে চিঁৎকার চেঁচামেচিঁ এবং মদ্যপানে জীবন অতিবাহিত করবে না। যদি আমরা এ রমযানের কল্যানকে নিজেদের মাঝে জারি রাখতে চাই তবে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জন করতে হবে। নিজের অর্থ-সম্পদ এমন ভাবে বইয়ে দেয়া যাবে না, যেভাবে জাগতিক লোকেরা বইয়ে দেয়। যার কিছু দৃশ্য আমরা বাহ্যিক চাকচিক্য হিসেবে দেখেছি। বরং এক প্রকৃত মু'মিন হয়ে রোযা রাখাকালে পিপাসা এবং ক্ষুধার যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা অতিক্রম করেছি, (এমনিতে আমরা ক্ষুধার পর পিপাসা বলে থাকি) পিপাসাকে আমি এ কারনে প্রথমে রেখেছি কেননা গরমের সময় ক্ষুধার তুলনায় পিপাসা বেশি লাগে, এই অনুভূতিকে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। নিজ ইবাদতের মাঝে পুণ্যকর্মগুলোও বহমান রাখতে হবে এবং নিজ অন্যান্য নেকীসমূহও বেগবান রাখতে হবে যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভকারী হয়ে থাকা যায়। এক মু'মিন যখন ***"রাব্বুনাল্লাহ্"*** বলে ঘোষণা দেয় তখন খোদা তা'লার আদেশাবলীই তার সবকিছু হয়ে যায় এবং হওয়া উচিতও বটে। কেননা এটি ব্যতিরেকে ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না। আল্লাহ্ তা'লা "রাব্বুনাল্লাহ্" বলার আদেশ দেবার পর অপর আদেশটি দিয়েছেন ***"সুম্মাসতাক্বামূ"***। মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হলো,- এটি তার জন্য জাগতিক কোন ঘোষণা নয় বরং সে এটির ওপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

তাই রোযার ব্যপারে যখন আমরা কথা বলি, রোযার নেকীসমূহ তখনি প্রকৃত ফলপ্রসু হবে যখন দৃঢ় পদক্ষেপে তা অবিরত রাখবে। কেবল মুখে দাবি করবে না বরং কৃতকর্মেও তা অবিরত থাকার বিষয়টি প্রকাশ ঘটাবে। তাই ঈদের দিনকে যদি প্রকৃত ঈদ বানাতে হয় তবে এটি অঙ্গীকার করুন যে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীকে পরবর্তীতেও অবিচলতার সাথে পালন করবো-ইনশাআল্লাহ্। ***"আতিউল্লাহ্-র"*** উপমা তখনি পরিপূর্ণতা লাভ করবে যখন খোদা তা'লার

আমাদের ঈদ জাগতিক লোকদের ঈদ নয়, আমাদের ঈদ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের ঈদ, যা জগতে খোদা তা'লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে লাভ হয়। তাই এর জন্য কুরবানী করার প্রয়োজন রয়েছে আর ঐ সকল কুরবানীর ফলশ্রুতিতে এ জগতে এবং পরকালেও জান্নাতের সুসংবাদ লাভ হচ্ছে আর ঈদের সুসংবাদও লাভ হচ্ছে।

আদেশাবলীর পরিপূর্ণ আমল করার চেষ্টা করা হবে আর এক মু'মিনের জন্য এটিই প্রকৃত ঈদ যেন সে আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যের সৌভাগ্য লাভ করে। আমি পূর্বেও বলেছি, এখন আমাদের ইবাদতের দিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। কেননা, এটি আল্লাহ্ তা'লার স্থায়ী আদেশ যা কেবল রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এতিমের লালন-পালনের প্রতি মনোযোগ দেয়ার আদেশ স্থায়ী আদেশ এটিও কেবল রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়ানোর আদেশ স্থায়ী আদেশ সেটিও কেবল মাত্র রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এবং কেবল রমযানের খেজুর আর ইফতারের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

তাই প্রত্যেক সামর্থ্যবান আহমদীকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ কুরবানীর প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন এবং জামাতী ভাবে যেসকল সাহায্য প্রকল্প আছে সেখানে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক যেন প্রকৃত আনন্দ লাভ হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ হয়। ঐ সকল দোয়া যা গরীবদের দ্বারা পাওয়া যায় সেই দোয়াই প্রকৃত আনন্দের কারন হয়। তাই আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মানুষ যখন বারবার খোদা তা'লার কাছে তাঁর গুনের বহির্প্রকাশ দেখতে চায়, বার বার তার করুনা এবং কল্যাণ আশা করে সেক্ষেত্রে স্থায়ী ভাবে নিজেকেও ঐ আদেশাবলীর ওপর চলার এবং তার আনুগত্য করা প্রয়োজন। যখন অবস্থা এমন হয় তখন ফিরিশতাও পদে পদে এমন লোকদেরকে সাহায্য করে। খোদা তা'লার সাহায্য সহযোগীতার ঐ সকল অলৌকিক নিদর্শন তখন প্রকাশিত হয় যাতে মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়। অতঃপর জান্নাতের সুসংবাদ লাভ হয়।

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়: হে আমার বান্দাগণ! চাও তোমাদের কি চাওয়ার আছে। তোমরা যেহেতু খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করতে চাও তাই তোমরা ঐ সকল কিছু লাভ করবে, ***"মা তাশতাহ্-ই আনফুসুকুম"*** অর্থাৎ তোমাদের হৃদয় যা আকাঙ্খা করে। আর এটিই এক প্রকৃত মু'মিনের ঈদ হয়ে থাকে আর হওয়াও উচিৎ।

অর্থাৎ খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পর খোদা তা'লার পুরস্কারসমূহ লাভ করবে আর সবচেয়ে বড় পুরস্কার হল খোদা তা'লার অনুগ্রহ লাভ এবং তাঁর ক্ষমার আচরণ। বলা হয়েছে, ***"নুযুলাম মিন গাফুরুর রাহিম"***। অশেষ ক্ষমাশীল খোদা এবং বার বার কৃপাকারী খোদার পক্ষ থেকে এটি মেহমানদারী স্বরূপ, অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ তা'লাকে নিজ প্রভূ বানিয়ে থাকো, তার সন্তুষ্টি যদি স্থায়ী ভাবে লাভ করার চেষ্টা করতে থাকো, তার আদেশাবলীর ওপর যদি আমল করতে থাকো এবং পুণ্যকর্ম অব্যাহত রাখো তাহলে কেবল তোমাদের সকল দুঃখ দূর হবে তা-ই নয় বরং দুনিয়া এবং আখেরাতের জান্নাত তোমরা লাভ করবে যা নিশ্চিত সকল ঈদের তুলনায় উত্তম ঈদ। তোমাদের আকাঙ্খাসমূহ পূর্ণতা লাভ করবে এবং এটি মেহমানদারিস্বরূপ আর এটি তোমাদের জন্য খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ঈদের দাওয়াতও বটে। নুযুল এর অর্থ খাবার, দাওয়াত এবং মেহমানদারিও (তিন অর্থেই নুযুল শব্দ ব্যবহার হয়)।

অতএব আমাদের মাঝে তারাই সৌভাগ্যবান যারা জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জান্নাত অর্জন করবে এবং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ঈদের দাওয়াত পেয়ে সৌভাগ্যমন্ডিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এমন ঈদ দান করুন।

এখন আমি পাকিস্তানি আহমদীদের উদ্দেশ্যে অথবা যে সকল দেশে আহমদীদের ওপর কঠোরতা আরোপ করা হচ্ছে তাদের ব্যপারে কিছু বলতে চাচ্ছি। ঐ সকল কঠোরতার ফলে বিশেষভাবে পাকিস্তানে এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে এমনকি মধ্যপ্রাচ্যে আহমদীরা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে ঈদের নামায পড়তে পারে না অথবা সহজে পড়া সম্ভব নয়। পাকিস্তানে তো একেবারেই সম্ভব নয়। সেখানের সমস্যা অনেক বেশি। বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুদের সেখানে ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়।

আমার কাছে অধিকহারে এমন পত্র আসে, পত্রের মাঝে খুবই দুশ্চিন্তা এবং নিরুপায় হওয়ার বিষয়টির প্রকাশ করা হয়, এবং তাদের বঞ্চিত থাকার বিষয়ে লেখা হয়। তারা লেখেন আমরা এ নেকী থেকে বঞ্চিত রয়েছি। পুরুষরা তো ছোট ছোট কেন্দ্র বানিয়ে ঈদের নামায পড়তে আসতে পারে। মহিলা এবং শিশুরা ঈদগাহ এবং মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারে না। যারা স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করছেন, আপনারা তাদের জন্য দোয়া করুন, যেন

আল্লাহ্ তা'লা এ কঠিন দিনগুলো অতি শিঘ্র সহজ করে দেন এবং তারাও যেন ধৈর্য্য এবং অবিচলতা দেখাতে পারেন। এ সকল কঠোরতা সহ্যকারীদের জন্যও জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা এ জগতেও তাদের অবিভাবক- এটি তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের এমনই সম্পর্ক রয়েছে কেননা তিনি এত কঠোরতা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা আছে নামসর্বস্ব মৌলভী, যাদের প্রত্যেকটি কর্ম অসৎ নিয়্যতে এবং অত্যাচার করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাদের অনেক ক্ষতি থেকে আল্লাহ্ সুরক্ষিত রেখেছেন। অন্যথায় শত্রুর ষড়যন্ত্র না জানি কত ভয়ংকর, যদি না আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অভিভাবক না হতেন। আল্লাহ্ তা'লা-ই সুরক্ষিত রেখেছেন এবং সর্বদা সুরক্ষিত রাখুন (আমীন)। আপনারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতিসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখবেন। আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, আমাদের ঈদ জাগতিক লোকদের ঈদ নয়, আমাদের ঈদ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের ঈদ, যা জগতে খোদা তা'লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে লাভ হয়। তাই এর জন্য কুরবানী করার প্রয়োজন রয়েছে আর ঐ সকল কুরবানীর ফলশ্রুতিতে এ জগতে এবং পরকালেও জান্নাতের সুসংবাদ লাভ হচ্ছে আর ঈদের সুসংবাদও লাভ হচ্ছে।

আল্লাহ্ করুন, যারা সমস্যায় নিপতিত তারা যেন অবিচলতা দেখাতে পারেন এবং ঐ সকল কঠোরতার সময় অতিক্রম করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভকারী হতে পারেন আর এ জগতে এবং পরকালে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত মেহমানদারী ভোগ করতে পারেন। এ দোয়াও করুন যে, হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে এটিও ভিক্ষা চাই যে, এ জগতেও আমাদেরকে ঈদের সেই ঝলক দেখাও যা আমাদের জন্য প্রকৃত ঈদের রঙ বহন করে। আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার শুকরিয়া জ্ঞাপন এভাবেও করার সৌভাগ্য দিন যে, আমরা আমাদের সকল শত্রু যাদের সংশোধন তকদিরে নেই তাদেরকে যেন অসফল এবং ক্ষতিগ্রস্থ হতে দেখতে পাই। তাদেরকে এমন শিক্ষনীয় নিদর্শন বানিয়ে দেখাও, যা সাধারণদের জন্য সংশোধনের কারন হয় যেন ইসলাম এবং আহমদীয়াতকে আমরা সমস্ত জগতে বিজয়ী অবস্থায় দেখে এ জগতের ঈদ প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং সেই ঈদ উদযাপন করতে পারি। আল্লাহ্ করুন, এ দৃশ্য যেন আমরা আমাদের জীবদ্দশায় দেখতে সক্ষম হই।

এখন আমরা দোয়া করব কিন্তু তার পূর্বে আপনাদেরকে, পৃথিবীর সকল জামা'তকে, ঐ সকল অত্যাচারিতদেরকেও যারা ভালভাবে ঈদ পালন করতে পারে নি, সকলকে ঈদ মুবারক জানাচ্ছি। এ ঈদ খোদা তা'লার অগনিত বরকত নিয়ে আগমন করুক। আমাদের প্রতি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তাঁর বংশধরের জন্যও দোয়া করবেন। এ যুগে আমাদের প্রতি মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অনুগ্রহ রয়েছে। অতএব তার বংশধরের জন্য দোয়া করবেন যেন তারা সঠিক এবং পুণ্যের পথে চলতে থাকে। আন্তর্জাতিক ইসলাম, বর্তমানে খুব বিপদের মাঝে আছে। এ জন্যও দোয়া করবেন যেন আল্লাহ্ তা'লা ইসলামী নেতাদেরকে বুদ্ধি দান করেন এবং শত্রুদের থেকে যেন তাদেরকে সুরক্ষিত রাখেন।

বিশেষভাবে জামা'তের উন্নতির জন্য দোয়া করুন, ওয়াকেফিনে জীন্দেগীদের জন্য দোয়া করুন, ওয়াকফে নওদের জন্য দোয়া করবেন তারা যেন তাদের ওয়াকফ পালন করতে পারেন আর এরা সংখ্যায় হাজার হাজার অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি ওয়াকফে নও আছে। তাদেরকে যেন সামলানো যায়। এরা যেন নষ্ট না হয়ে যায়। অসুস্থ্যদের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে যেন আরোগ্য দান করেন। খোদার রাস্তায় বন্দীদের জন্য দোয়া করুন যেন তাদের বন্দী জীবন দ্রুত শেষ হয়ে যায়।

আর্থিক কুরবানীকারীদের জন্যও দোয়া করবেন, আল্লাহ্ যেন তাদের সম্পদে-সন্তানে অশেষ বরকত দান করেন। মানুষ যে ধরনের দোয়ারই মুখাপেক্ষী তাদের সকলের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। অত:পর খুতবা সানিয়ার পর হুযূর (আই.) দোয়া করান।

অনুবাদ: *মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান*
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

প্রকাশিত হয়েছে

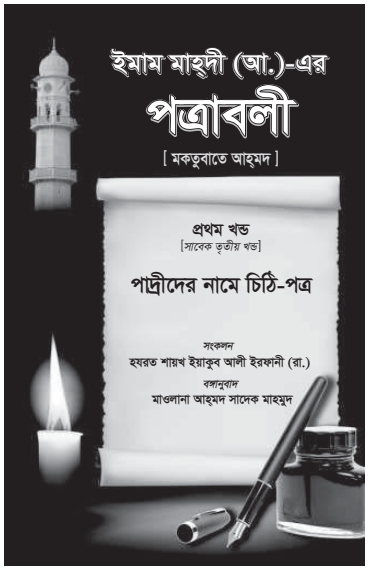

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**।

বই দু'টির মূল্য যথাক্রমে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং ৭৫/- (পচাত্তর টাকা)।

বই দু'টি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৬ এপ্রিল ২০১৩-এর জুমুআর খুতবা।

ইসলাম একটি শান্তি প্রিয় ধর্ম এবং এর শিক্ষা হলো উত্যন্ত উচ্চাঙ্গের

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

❖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿النساء: ١٣٦﴾

❖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿المائدة: ٩﴾

❖ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿المائدة: ١٠﴾

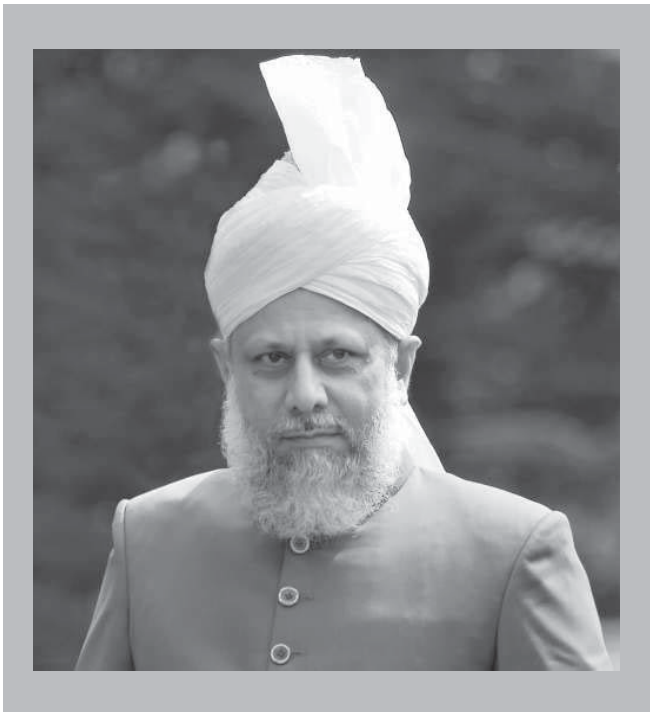

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হল, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র সুন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সেই (সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও। (যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে) সে ধনী হোক বা গরীব হোক আল্লাহ্‌ই উভয়ের সর্বোত্তম অভিভাবক। অতএব তোমরা যাতে ন্যায়বিচার করতে (সক্ষম) হও (সে জন্য) তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তোমরা যদি পেঁচানো কথা বল অথবা (সত্যকে) এড়িয়ে যাও তবে (মনে রেখো) তোমরা যা কর সে বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ্ পুরোপুরি অবগত আছেন। (সূরা আন্ নিসা-১৩৬)

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা যেন কখনোই তোমাদের অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায়বিচার করো। এ (কাজটি) তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো। তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবগত আছেন।

যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে। (সূরা আল্ মায়েদা ৯-১০)

ইসলাম বিরোধীরা বিভিন্ন সময় ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর চরমপন্থী হবার এবং অ-মুসলিমদের জন্য (মুসলমানদের) মনে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করার আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। পৃথিবীতে যে সব সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটে তা নিজেদের মুসলমান দাবি করে এমন কারো পক্ষ থেকে ঘটুক বা অন্য কারো পক্ষ থেকেই ঘটুক অথবা নামসর্বস্ব কিছু ইসলামী দল বা জিহাদী অঙ্গসংগঠন যেসব কার্যকলাপ করে, এ সব কিছুর দায়ভারই ইসলামী শিক্ষার উপর চাপানো হয়।

এছাড়াও কুরআন করীম ও মহানবী (সা.)-এর সত্তাকে, চরম বাজে ও অশালীন ভাষার লক্ষ্যস্থল বানানো হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বর্তমানে যুগ-ইমাম ও রাসূল (সা.)-এর প্রেমিকের জামা'ত রয়েছে, যারা কুরআন করীমের শিক্ষার আলোকে ইসলাম বিরোধীদের প্রত্যেক আপত্তির খন্ডন করে। আর প্রতিটি অশালীন উক্তির উত্তর দিয়ে ইসলাম বিরোধীদেরকে তাদের স্বরূপ দেখিয়ে দেয়। আমাদের পক্ষ থেকে ধর্মীয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে যে সব আয়াত উপস্থাপনা করে বলা হয় যে, ইসলাম একটি শান্তি প্রিয় ধর্ম এবং এর শিক্ষা হলো উত্যন্ত উচ্চাঙ্গের, সেগুলোর মধ্য থেকে একটি আয়াত আমি পাঠ করেছি। এই আয়াতটিও (ইসলাম একটি শান্তি প্রিয় ধর্মের প্রমান) রুপে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

এ এক এমন অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা যে প্রত্যেক ন্যায় পরায়ন অ-মুসলিম এই শিক্ষা শুনে, প্রশংসা না করে পারে না। কিন্তু তারা প্রশ্ন করে, এ শিক্ষার ওপর আমল কোথায়? আহমদীরা জানে, অ-মুসলিমরা তাদেরকে বলে, এ কথা ঠিক, তোমাদের জামা'তের সদস্যদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষার আলো দেখা যায়। কিন্তু তোমরা তো একটি ছোট সম্প্রদায়। ইসলাম সম্পর্কে ধ্যান ধারনা আমরা তো অন্যান্য মুসলমানদের থেকে নিব।

সাধারণ আহমদীরা তাদের নিজ নিজ বুদ্ধি ও জ্ঞান অনুযায়ী এমন সব প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন এবং সাধারণত এসব উত্তরের ভালো প্রভাব তাদের ওপর পড়ে। তবে আমাদের বাস্তববাদী হওয়ারও প্রয়োজন আছে এবং নিজেদের পর্যালোচনা করাও আবশ্যক। আমরা কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.) এর জীবনীর উদ্ধৃতি দিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করি এবং আমরা সফলও হয়ে যাই।

এ কারনে বর্তমানে পত্রিকা লেখকগণ যখন ইসলাম সম্পর্কে লিখে তখন কখনও তারা সরাসরি আবার কখনও নাম না নিয়ে ইঙ্গিতে এ কথা বলে, ইসলামে এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে যারা মুসলমানদের মধ্যে যে উগ্রতা দেখা দেয় এর বিরোধী।

এ জামা'ত পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তারা দাবী করে, আমরাই কেবল ইসলামের শিক্ষার ওপর পরিচালিত। অন্যদের মুখে আমি যখন জামা'তের সম্বন্ধে এমন মন্তব্য শুনি এবং অন্যদের সামনে আমি যখন ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরি তখন আমার মনোযোগ নিজেদের পর্যালোচনার করার প্রয়োজনিয়তার প্রতি আকৃষ্ট হয় যে আমরা এই শিক্ষার বাস্তবায়ন নিজেদের মাঝে কতটুকু করেছি। কোথাও এই অনিন্দ সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীবাসীর সামনে তুলে ধরে আপত্তিকারীদের মুখ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়াটাকে যথেষ্ট মনে করছি না তো। সময় আসার পর যখন তারা আমাদের যাঁচাই করবে তখন কোথাও এমন না হয় যে আমাদের মাঝে সেই উত্তম শিক্ষা বিদ্ধমানই নেই।

কোন জামা'তের সত্যতার প্রমান এবং কোন কিছুর সত্যতার দলীল তখন পাওয়া যায় যখন বিপদ সংকুল অবস্থায় নিজেদেরকে বিপদের মুখোমুখি করে খোদার সন্তুষ্টির জন্য তাঁর শিক্ষাকে আত্মস্থ করে তা বাস্তবায়ন করা হয়। আর তারা এমন পর্যায়ের সৎকর্মশীল হয়ে থাকে যার ফলে তারা এ অবস্থা থেকে সফলকাম হয়ে বেড়িয়ে আসে। নতুবা অনিন্দ সুন্দর শিক্ষার বাস্তবায়ন না হলে তা কোন জামা'তকে সামগ্রিকভাবে সুন্দর করে তুলে না।

কিছু এমন অ-আহমদী মুসলমান রয়েছে যারা অন্যান্য ধর্মালম্বীদের কাছে ইসলামের এই অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা হয়তো তুলে ধরেন। ইসলামের এই অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরা অর্থাৎ হয়তো শুধুমাত্র তার সত্তাকে অমুসলিমদের সামনে ভালো মানুষ রুপে তুলে ধরে। অথবা সেই ব্যক্তির (অর্থাৎ আপত্তিকারকের) চরিত্রের কারনে অথবা সেই ব্যক্তির (অর্থাৎ মুসলমানের) সাথে সম্পর্কের কারনে ধর্মের ওপর আপত্তি করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু একজন আহমদীকে স্মরণ রাখতে হবে, সে যখন ইসলামের শিক্ষাকে বিশ্ববাসীর সামনে রাখে তখন নিজেকে 'আহমদী মুসলমান' হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকে। এ যুগে যিনি ইসলামকে পুনর্জীবিত করার দাবী করেন এবং এই দাবী নিয়ে দন্ডায়মান, সেই ব্যক্তির অনুসারী হিসাবে সে নিজের পরিচয় প্রদান করে। সে পরিচয় দেয়, আমি সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে মেনেছি যিনি পৃথিবীতে ইসলামের অনুপম সুন্দর শিক্ষা উপস্থাপনের জন্য এসেছেন এবং একটি (ঐশী) জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

একজন আহমদীর পক্ষ থেকে ইসলামের সুন্দর শিক্ষার বর্ণনা কেবল একজন আহমদীর ব্যক্তিগত পরিচয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং সে শান্তিপ্রিয়, ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্যের ব্যাপারে নির্ভিক, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বাস্তবায়নকারী এক জামা'তের চিত্র অন্যদের সামনে তুলে ধরে। আর এমনই হওয়া উচিত। কোন আহমদীর কথা ও কাজে অসামঞ্জস্য দেখা দিলে, কেউ বলবে না, 'উমুক ব্যক্তি' মুখে বলে একটা আর করে অন্যটা, তার মাঝে সততা নেই বা সে নীতিবান নয় বরং তৎক্ষণাত বলা হয়, দেখ! 'উমুক আহমদী', এরা পূন্যের ব্যাপারে খুব বুলি আওড়ায়, এই জামা'ত নিজেদেরকে এই যুগের ন্যায় প্রতিষ্ঠার কর্ণধার বলে মনে করে কিন্তু এ জামা'তে যারা অন্তর্ভূক্ত হয় তারা বিভিন্ন অনাচারে লিপ্ত।

এমন অনেক অ-আহমদী রয়েছেন যারা আহমদীদের সাথে ব্যবসায়-বানিজ্যও করেন, যখন তাদের মাঝে ব্যবসায়িক কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়ে, কোন মামলা হয় তারা আমার কাছে এ কথাই লিখে, উমুক ব্যক্তি আহমদী ছিল, আমরা তাকে বিশ্বাস করেছি, এখন এই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এখন ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যে সাক্ষি দেয়া উচিত ছিল, দিচ্ছে না। ন্যায়বিচার করে আমার প্রাপ্যও আমাকে দিচ্ছে না।

অতএব একজন আহমদী (কখনও কখনও) নিজের কর্মের ফলে জামা'তে আহমদীয়ার ভাবমূর্তী ক্ষুন্ন করে এবং একটি মন্দ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে জামা'তকে কলঙ্কিত করার কারণ হয়। এর ফলে তারা বেশী গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। কেননা তাদের দাবী পূণ্যের কিন্তু কর্ম সম্পূর্ণ বিপরিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-ও এ চিন্তায়

আজ পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, সত্যের বিস্তার করার জন্য,শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য স্থায়ীভাবে ও সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্ম বিষয় সম্মুখে রেখে কাজ সম্পাদন করা একজন মুমিনের দায়িত্ব। আর এটিই হচ্ছে একজন প্রকৃত আহমদীর কাজ। বর্তমান যুগে কেবল আহমদী মুসলমানই রয়েছে যারা এ দাবীর মাধ্যমে এবং নিজেদের কর্ম দ্বারা এটি প্রকাশ করে যে, আমরাই প্রকৃত মুসলমান। আমরাই সত্যিকারের মু'মিন। কেননা আমরা যুগ ইমামকে মান্য করেছি।

চিন্তিত ছিলেন, যার ফলে তিনি বলেছিলেন, "আমার প্রতি নিজেকে আরোপ করে আমাকে কলঙ্কিত করো না।" (মালফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৫, প্রকাশনা-রাবওয়া, ২০০৩)

আমি তাঁর কথার সারমর্ম বললাম। অর্থাৎ কোন আহমদীর কোন ক্ষেত্রে এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের দুর্নামের কারণ হবে।

উপরের আয়াতগুলোতে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে সর্ব ক্ষেত্রে এতে আমল করা প্রয়োজন। আর এমন করলে এসব বিষয় স্বভাবের অন্তর্গত হয়ে মন্দ থেকে বিরত রাখাতে সাহায্য করবে। আমাদের কাজ কি হওয়া উচিত? সবক্ষেত্রেই এ বিষয়ের প্রতি যেন আমাদের দৃষ্টি থাকে। কখনও কোনও ধরনের অন্যায় কাজ, ন্যায় পরিপন্থি বা সততা বিবর্জিত বা অন্যের ক্ষতিসাধনের চিন্তা কারো মাঝে সৃষ্টিই হতে পারে না যদি সে এতে (অর্থাৎ কুরআনের শিক্ষার ওপর) সঠিকভাবে আমল করে এবং এগুলো যদি তার স্বভাবের অংশ হয়ে হয়ে যায়।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার অনুপম শিক্ষা এবং ইসলামের সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তীর বহিঃপ্রকাশ তখনই সম্ভব যখন প্রত্যেক আহমদী প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে এই শিক্ষার বাস্তবায়ন করবে।

এই আয়াতে বর্ণিত মানদন্ডের আদর্শ নিজেদের ঘর, সমাজ, আপন-পর, এমনকি শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। তবেই আমরা প্রকৃত মু'মিন হতে পারবো, তখনই যুগ ইমামের সাথে সম্পৃক্ত হবার দাবী এবং ঘোষণার যথার্থতা সাব্যস্তকারী হতে পারবো, নতুবা আমাদের দাবী অন্তসারশুন্য হবে। আর সেক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আমাদের বিষয়ে যে উদ্বেগ ছিল যে কোথাও না আমরা তাঁর দুর্ণামকারী হয়ে যাই, আমরা তাঁর এই উদ্বেগকে আরও বাড়ানোর কারণ সাব্যস্ত হবো।

আমাদের চেষ্টা করা উচিত, আমরা যেন তাঁর (আ.) এই উদ্বেগকে যতটুকু সম্ভব কমাতে সক্ষম হই; শুধু তাই নয়, যেন এটাকে নি:শ্বেষ করে ফেলতে সক্ষম হই। এখানে প্রথম যে বিষয়টির নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা হলো- আমাদের প্রত্যেক বিষয়ে সাক্ষ্য খোদা তা'লার জন্য হওয়া আবশ্যক, খোদা তা'লার বিধি-বিধান অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। এ সাক্ষ্য অথবা আমরা যে সাক্ষ্যই দেই না কেন এর প্রেক্ষিতে মনে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি করার বাসনার উদ্রেগ হওয়ার উচিত নয়। বরং শুধুমাত্র এ চিন্তা করাই আবশ্যক, আমি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই, আর শুধু মাত্র খোদাকেই খুশি করতে চাই।

আবার তিনি (আ.) বলেন, ন্যায় বিচারের উচ্চ মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত হলেই এটা অর্জিত হবে । আর ন্যায় বিচারের উচ্চ মানদন্ড সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যতিত হতে পারে না। মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশ, 'যা নিজের জন্য পছন্দ কর তা অন্যদের জন্যও পছন্দ কর'-এর উপর আমল ব্যতিত এই মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আমাদের নিজের ক্ষেত্রে চেষ্টা প্রচেষ্টা হয়ে থাকে আমরা যেন নিজের অধিকার পুরোপুরি বুঝে পাই। কোথাও যদি সামান্যতম আমাদের অধিকার হরণ করা হয় তাহলে আমরা চিৎকার করতে শুরু করে দেই। কিন্তু যখন অন্যের অধিকারের প্রশ্ন আসে তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের বাহানা খুঁজতে থাকি। নিজেদের ক্ষেত্রে যদি ন্যায় বিচারের প্রশ্ন আসে তাহলে আমরা কুরআনের সমস্ত বিধি-বিধান মিমাংসাকারীর সামনে উপস্থাপন করি। খুব পরিশ্রম করে হাদীস অনুসন্ধান করে অধিকার হরণকারীদের এবং সিদ্ধান্ত প্রদানকারীদেরকে খোদার ভয় দেখাই।

হুযুর বলেন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতিসমূহ উপস্থাপন করি। কিন্তু যখন আমাদের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সত্য সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি কামনা করা হয় তখন সত্য সাক্ষ্য দেয়ার পরিবর্তে, ন্যায় কথা বলার পরিবর্তে পেঁচানো ও তালগোল পাকানো কথা বলে বিষয়টিকে গুলিয়ে ফেলার অথবা নিজের স্বপক্ষে নেয়ার অথবা নিজের আত্মিয় পরিজনদের পক্ষে নেয়ার চেষ্টা করে থাকি। এ বিষয়টি এক মু'মিন অর্থাৎ একজন প্রকৃত মু'মিনের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত নয়।

তাই প্রকৃত মু'মিনের জন্য নির্দেশ হলো, খোদার নির্দেশকে অগ্রগণ্য রেখ আর বাকি সব কিছুকে এর অধিনস্ত রেখ। আর মনে সাহস সৃষ্টি হলে পড়েই মানুষ নিজের বিরুদ্ধেও সাক্ষী দিতে দ্বিধা বোধ করবে না। সত্য বিষয় বলার কারণে অথবা সত্য সাক্ষ্য

দেয়ার কারণে যে কতটুকু বিপদাবলীর সম্মুক্ষীণ হতে সে এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। অথবা তার নিকটাত্মীয় ও তার সন্তানের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার কারণে তারা বিপদগ্রস্থ হতে পারে অথবা তার পিতা মাতা অথবা তার সন্তানাদী অথবা তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার কারণে তাকেই না কতসব বিপদাবলীর সম্মুখীন হতে হবে (সে এ সবের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করবে না)।

আমাদের এ নীতি অবলম্বন করা উচিৎ যে সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আমাদেরকে যদি নিজ পরিবেশ, স্বজন ও বয়োজেষ্ঠদের অসন্তুষ্টির সম্মুখিনও হতে হয় তবে সেজন্য আমরা প্রস্তুত আছি। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমাদের প্রাচুর্য বা দারিদ্র, তোমাদের চালাকী বা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান বা ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত হবার উপর তোমাদের লাভ-ক্ষতি নির্ভর করে না, বরং আল্লাহ্ তা'লার আশীষ ও করুণার উপর তা নির্ভর করে।

আল্লাহ্ তা'লা চাইলে তোমাদের কল্যাণমন্ডিত করতে পারেন, নইলে তোমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তোমরা কোন কল্যাণ অর্জন করতে পারবে না। মিথ্যা সাক্ষ্য তোমাদের কোন উপকারে আসবে না।

হ্যাঁ, এক সাময়িক পার্থিব কল্যাণ লাভ হতে পারে, কিন্তু এর পরই আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারনে ক্ষতির পরিমান এত বেশী হবে যা তোমাদের পক্ষে অসহনীয়। এজন্য আল্লাহ্ তা'লাকে নিজের বন্ধু বানাও এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন কর। ন্যায়ের দাবী পূরণে সর্বদা স্বচ্ছ ও সোজা কথা বল। ঘড়োয়া ও পারিবারিক বিষয়াবলীতে এবং সামাজিক ও পার্থিব বিষয়াবলীতে সর্বদা সততাকে আঁকড়ে ধরে থাক। সর্বদা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কর। নিজ হীন কামনা-বাসনার অনুসরণ করে ন্যায় ও সত্য থেকে বিচ্যুত হবার পরিবর্তে, ঘুড়িয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে বিষয়কে জটিল করার পরিবর্তে বা সত্য সাক্ষ্য গোপন করার পরিবর্তে এবং আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করার পরিবর্তে একজন মু'মিনের সর্বদা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকে নিজের লক্ষ্য নির্ধারন করা আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবনের একটি ঘটনা রয়েছে। জমি-জমা সংক্রান্ত একটি মামলায় তাঁকে সাক্ষ্য প্রদান করতে হয়। কয়েকজন চাষীর সাথে গাছপালা নিয়ে বিরোধ ছিল। তারা জানতো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সাক্ষ্য দেবেন। যদিও তাঁর পিতার এবং পারিবারিক সম্পত্তির বিষয় ছিল, জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয় ছিল, কিছু গাছের মালিকানা সংক্রান্ত বিষয় ছিল। যখন সাক্ষ্য প্রদান করা হল, তাঁকে (আ.) ডাকা হল, তিনি জজের সামনে বললেন, আমার মতে এটি এ লোকদেরই পাওনা এবং তাদের এ পাওনা তাদের দিয়ে দেয়া উচিৎ। এজন্য তাঁর পরিবারের লোকজন, বিশেষভাবে তাঁর পিতা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু তিনি বলেন, আমি যেটা সত্য ও ন্যায় বলে মনে করেছি তাই সাক্ষ্য দিয়েছি। (তারিখে আহমদীয়াত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩)

এ উচ্চমানের দৃষ্টান্ত যুগের ইমাম আমাদের সামনে পেশ করেছেন এবং এ উচ্চমান অর্জনের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এ উচ্চমান আর্জনের জন্যই মহানবী (সা.) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, স্বরন রেখো, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে তোমরা পৃথিবীর লোকদের ধোকা দিতে পারবে, কিন্তু খোদা তা'লাকে নয়। 'ফাইন্নাল্লাহা কানা বিমা তা'মালুনা খাবিরা'। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সব কাজ ও বিষয়ে উত্তমরুপে অবগত আছেন। তাঁর কাছে কিছুই গোপন করা সম্ভব নয়।

অতএব, একদিকে এ দাবী যে আমরা সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বিস্তার করতে চাই, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্ববাসীকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করতে চাই, অপরদিকে নগন্য পার্থিব ফায়দার লোভে আমরা যদি আমাদের কথা ও কাজে বৈপরিত্য রাখি, তবে আমরা সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নই, শান্তি ও সম্প্রীতি বিস্তারকারী নই, বরং সমাজের ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার অংশীদার বলে সাব্যস্ত হব।

কাজেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজন মু'মিনের সোচ্চার হওয়ার দাবী এবং অন্যায় কাজে বাধা দান করার দাবী কেবল তখনই সত্য বলে পরিগনিত হতে পারে যখন সে ন্যায়পরায়ণতার উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করবে, সে সত্যতার উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করবে। যে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী নিজ স্বাক্ষ্য সমূহ প্রদান করবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মান কেমন দেখতে চান এ ব্যপারে কুরআন করীমের সূরা মায়েদার যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি তাতে তিনি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কেবল তোমাদের দেশ বা তোমাদের চারপাশ যা মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত তোমাদের স্বাক্ষ্য যেন কেবল সেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সীমাবদ্ধ না হয় বরং যদি তোমাদের শত্রুরাও তোমাদের কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার আকাঙ্খী হয় তারাও যেন তা পায়। তাদের মাঝে যেন এই বিশ্বাস থাকে যে তোমরা সর্বদা সত্য ও ন্যায় কথা বলবে। অথবা শত্রুদের নিকট এটি স্পষ্ট করে দাও একজন মুমিন সর্বদা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কাজ করে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। কারো বিরোধীতা আমাদেরকে ন্যায় বিচার বা সত্যতা থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। আমাদের হৃদয় তো শত্রুতা থেকে পবিত্র। আমরা তো এটা ঘোষণা করি যে আমাদের কারো সাথে কোন বিদ্বেষ ও শত্রুতা নেই। কিন্তু শত্রুদের হৃদয়ের ঘৃনা, রাগ ও শত্রুতাও আমাদেরকে এ বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করতে পারবে না যে আমরা কোন মন্দ উপায়ে তাদেরকে ক্ষতি করার জন্য ন্যায় পরায়নতা থেকে বিচ্যুত হয়ে কোন কথা বলব। এটা হচেছ সেই অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা যা আমরা অন্যদের সামনে উপস্থাপন করি এবং তাদের সামনে ইসলামী শিক্ষা সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করি। তারা আমাদের কথা শ্রবন করে এবং ইসলামের ব্যপারে জানার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহী হয়।

আমাদের এটা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে নি:সন্দেহে আমাদের কথা মানুষকে আমাদের দিকে ধাবিত করে। কিন্তু আমাদের সত্য স্বাক্ষ্য দেয়ার বিষয়, আমাদের ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার বিষয়,আমাদের দেশে শত্রুতা দূরীকরনের বিষয়, আমাদের পক্ষ থেকে শান্তি ও নিরাপওার বাণী পৌঁছানো কেবল তখনই জগদ্বাসীকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করবে যখন আমাদের কর্মকান্ডও সেই অনুযায়ী হবে। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একটি অনেক বড় দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা 'কাওওয়াম' অর্থাৎ ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী হিসাবে দাঁড়িয়ে যাও। 'কাওওয়াম' এর অর্থ কোন কিছুর গভীরে গিয়ে পর্যালোচনা করা এবং ধারাবাহিকভাবে দৃঢ়তার সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা বা কোন কাজ করা। কেননা এখানে যেহেতু

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার কথা রয়েছে তাই এর গভীরে গিয়ে ন্যায় বিচারের সকল শর্ত পূর্ণ কর। অত:পর স্থায়ীভাবে এবং দৃঢ়তার সাথে তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা কর। গভীরে গিয়ে বিরামহীন ও স্থায়ীভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে পৃথিবীতে শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার বাণীও জগদ্বাসীর নিকট পৌঁছে যাবে।

সুতরাং আজ পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, সত্যের বিস্তার করার জন্য,শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য স্থায়ীভাবে ও সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্ম বিষয় সম্মুখে রেখে কাজ সম্পাদন করা একজন মুমিনের দায়িত্ব। আর এটিই হচ্ছে একজন প্রকৃত আহমদীর কাজ। বর্তমান যুগে কেবল আহমদী মুসলমানই রয়েছে যারা এ দাবীর মাধ্যমে এবং নিজেদের কর্ম দ্বারা এটি প্রকাশ করে যে, আমরাই প্রকৃত মুসলমান। আমরাই সত্যিকারের মু'মিন। কেননা আমরা যুগ ইমামকে মান্য করেছি।

কেননা আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বিষয়ে অবগত হয়েছি। আর যুগের ইমামকে মেনে আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার বিধিবিধানের বিষয়ে তাত্ত্বিক ও বাস্তবমুখি জ্ঞান অর্জন কারী হই নি বরং আমরা তার বিধি-বিধানের উপর ব্যবহারিক নমুনা প্রদর্শণকারী হওয়ারও চেষ্টা করে থাকি।

তাই আমি যেভাবে বলেছি, এবিষয়ে আমাদের পর্যালোচনার প্রয়োজন। আমরা কতটুকু ন্যায়-বিচারের ওপর এবং আমরা সত্যের উপর কতটুকু প্রতিষ্ঠিত রয়েছি সে বিষয়ে আর নিজেদেরকে আত্মজিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের বিরুদ্ধে, নিজের পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে জাগতিক লাভকে কোন গুরুত্ব দেন নি। আজ আমরা যারা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হবার দাবী করছি তারা এই মানদন্ড অর্জন করার চেষ্টা করছি কি না? যদি আমরা প্রকৃতপক্ষেই এই মানদন্ড অর্জনের চেষ্টাকারী হই তাহলে এটিও দেখার ও চিন্তা করার বিষয়, আমাদের ঘরে কেন আস্থাহীনতার সৃষ্টি হচ্ছে? যেসব ঘরে আস্থাহীনতার বিষয় রয়েছে তারা তাদের হিসাব নিন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার বিষয় কেন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না? বাচ্চারা কেন এই কারণে ত্যাক্ত-বিরক্ত হচ্ছে। ভাই ভাইয়ের সম্পর্কে কেন ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে? মন্দ ধারণার কারণে অথবা সত্যের ঘাটতি থাকার কারণে সম্পর্ক কেন ভেঙ্গে যাচ্ছে? বন্ধুত্বের ভিত্তিতে শুরু করা ব্যাবসা-বাণিজ্য অসন্তোষের এবং মামলা-মোকাদ্দমার মধ্যে কেন গড়াচ্ছে? কাযা বোর্ডের নিকট বিচারের সংখ্যা কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথবা আহমদীরা কেন অনেক সংখ্যায় মুকাদ্দমা নিয়ে আদালতে যাচ্ছে। বেশি মামলা হওয়া এথেকে প্রকাশিত, হৃদয়ের অবস্থা আর বাহ্যিক অবস্থা অথবা কথা পরস্পর বিরোধী। নিজের জন্য মানদন্ড একটি আর অন্যের জন্য আর একটি। তাই প্রত্যেক আহমদীকে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক, হোক সে জামা'তি কোন কর্মকর্তা অথবা সাধারন আহমদী।

আমাদেরকে দুনিয়ার সামনে ন্যায়-বিচার প্রদান এবং সত্য বিস্তারের এতবড় কাজ রয়েছে, এটাকে আমরা আমাদের নিজেদের সংশোধন করে কিভাবে সম্পন্ন করতে পারি, যাতে করে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর ক্ষমার চাদরে নিজেদেরকে জড়িয়ে নিতে পারি। আর তাঁর নিকট থেকে প্রতিদানপ্রাপ্ত হিসাবে পরিগণিত হতে পারি। নিশ্চয় আমাদেরকে খোদা তা'লার বিধি-বিধানের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে এবং এর উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"খোদা তা'লার হেফাজতের ন্যায় কোন সুরক্ষিত দূর্গ আর কেল্লা নেই। তবে অসমাপ্ত বিষয় কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তৃষ্ণা পেলে কেউ কি একথা বলতে পারে, এক বিন্দু পানি যথেষ্ট হবে অথবা প্রচন্ড ক্ষুধায় একটি দানা বা একমুঠো খাবারে তৃপ্ত হয়ে যাবে। কখনো নয়, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ তৃপ্ত হয়ে পানি পান করবে না বা খাবার খাবে না, ততক্ষণ সন্তুষ্ট হবে না। তদ্রূপ যতক্ষণ পর্যন্ত কাজে পরিপূর্ণতা আসবে না (ততক্ষণ) সে ফলাফলও সৃষ্টি হবে না যা হওয়া উচিত। অসম্পূর্ণ কর্ম না খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে পারে আর না কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদাও এটিই, 'আমার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ কর তা হলে আমি বরকত দিব।" (মালফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৬৩৯, প্রকাশনা-রাবওয়া, ২০০৩)

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার সংবাদ সম্প্রসারণের যে দায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন সেটির জন্য প্রত্যেক স্তরে ন্যায় এবং সততাকে কায়েম করতে হবে। ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়–আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ সমূহের গভীরে গিয়ে সেটিকে বুঝা এবং আমল করার মাধ্যমে। 'হুকুকুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র হক) পালনের ক্ষেত্রেও সেটির গভীরে গিয়ে বুঝা আর সেগুলোর উপর আমল করা আবশ্যক। 'হুকুকুল্ ইবাদ' (বান্দার হক) আদায়ের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লার সমস্ত নির্দেশাবলীর গভীরে গিয়ে বুঝা ও সেগুলোতে আমল করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এর তৌফিক দান করুন।

আমরা যেখানে নিজেদের ঘর এবং সমাজকে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করে জান্নাত সাদৃশ্য করব সেখানে ইসলামের সুন্দর শিক্ষার আলোকে তবলিগের দায়িত্বও পালনকারী হব। পৃথিবীতে প্রকৃত ন্যায়ের শিক্ষা সুস্পষ্ট করে সেটিকে ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষাকারী হব। পৃথিবী অত্যন্ত বিপদসংকুল ধ্বংসের দিকে অতি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। মুসলমান, অ-মুসলিম কারো মাঝে ইনসাফ অবশিষ্ট নেই আর কেবল যে ইনসাফই অবশিষ্ট নেই তা নয় বরং যুলুমের সব সীমা সমূহকেও ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে পৃথিবীর চোখ উন্মোচন আর যুলুম থেকে বিরত রাখার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষার দায়িত্ব কেবল জামা'তে আহমদীয়াই পালন করতে পারে। এজন্য আমাদের প্রত্যেকের যেখানে কার্যকরী চেষ্টার প্রয়োজন সেখানে কার্যকরী এ চেষ্টার সাথে দোয়ার দিকেও অনেক দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন। মুসলমান দেশ সমূহের অন্যায় এবং কর্মের মন্দ পরিণাম যেখানে তাদেরকে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত করে রেখেছে সেখানে বাইরের বিপদাবলীও অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাদের উপর ঘুর পাক খাচ্ছে বরং তাদের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছে। দৃশ্যত: মনে হয় বড় যুদ্ধ মুখ খুলে দাঁড়িয়ে আছে, পৃথিবী যদিও এর পরিণাম থেকে অজ্ঞ নয় তথাপি অবশ্যই গাফেল।

অতএব এমন পরিস্থিতিতে মোহাম্মদী মসীহ্-র সেবকদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করে পৃথিবীকে ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য দোয়া করার হক আদায় করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এর হক আদায়কারী করুন আর পৃথিবীকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করুন।

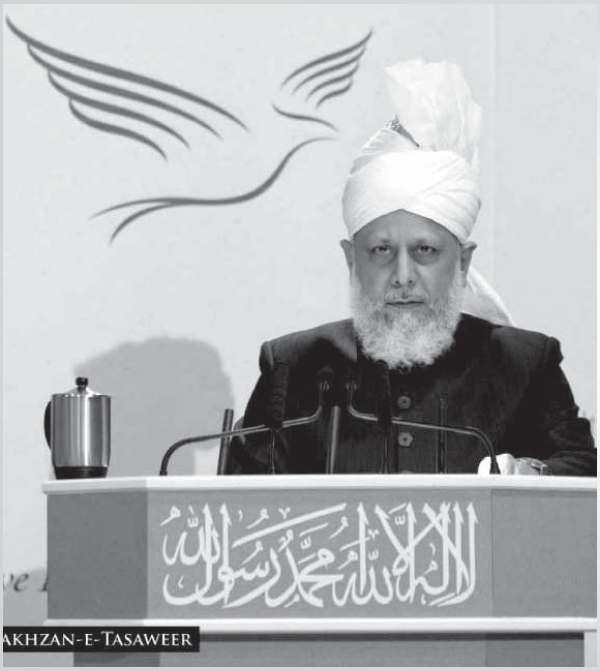

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, জার্মানীর ২০১১ সালের বার্ষিক ইজতেমায় আতফালদের উদ্দেশ্যে ১৬ সেপ্টেম্বর প্রদত্ত হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর ঐতিহাসিক বক্তৃতা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

ফোনের মাধ্যমেও বিভিন্ন মন্দ অভ্যাস রপ্ত হয়। অনেক সময় দুষ্ট প্রকৃতির অচেনা মানুষ ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আর তাদের প্রলোভনে ছেলে-মেয়েরা প্রলুব্ধ হয়, এরা উঠতি বয়সী ছেলে-মেয়েদের মাঝে নোংরা অভ্যাস সৃষ্টি করে দেয়, আর এর ফলে অজ্ঞাতসারে তারা বিভিন্ন অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ে। এজন্য এই মোবাইল ফোনও অনেক ক্ষতিকর জিনিষ। এভাবে ছেলে-মেয়েরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভুল কর্মকান্ডের সাথে অনেক সময় জড়িয়ে যায়। তাই, এথেকে বেঁচে থাকা উচিত।

হুযূর (আই.) বলেন, খোদ্দামুল আহমদীয়া, জার্মানীর সদর সাহেবের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে আজ আমি আপনাদের সম্বোধন করছি। আমার যতটুকু মনে পড়ে, সম্ভবত ইজতেমা উপলক্ষে আতফালুল আহমদীয়া, জার্মানীকে এবারই প্রথম সরাসরি কিছু বলছি।

যাহোক, আতফালুল আহমদীয়া– আহমদীয়া জামা'তের এমন একটি সংগঠন যাদের উপর ভবিষ্যত নির্ভর করে। আজকের শিশু আগামীর যুবক ও জাতির নেতা। এজন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন তখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ শিশুদেরও একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন– যা 'আতফালুল আহমদীয়া' নামে পরিচিত। আতফালের মধ্যেও দু'টি ভাগ আছে: একটি ছোট আরেকটি বড়, একটি সাত থেকে দশ বা বারো বছর বয়সের শিশুদের, আরেকটি বারো থেকে পনের বছরের কিশোরদের। এরপর রয়েছে খোদ্দামুল আহমদীয়া।

মোটকথা, আতফালুল আহমদীয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সংগঠন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁর দৃষ্টিতেও এ বিষয়টি ছিল, জাতির এবং জামাতের প্রত্যেক শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ যেন এতটা যোগ্যতা অর্জন করে যাতে তারা জামাতের দায়িত্ব পালন করতে পারে। জামাতের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে যেন তারা সক্ষম

হয়। অনেক কিশোর, যাদের বয়স দশ-বারো বছরের চেয়ে বেশি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা বুঝতে শিখেছে আর ভালো কোনটি আর কোনটি মন্দ তা তারা জানে। তারা নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করতে পারে; আর বর্তমানে স্কুলে যে-শিক্ষা দেওয়া হয় আল্লাহ্‌র কৃপায় তা শিশু-কিশোরদের মন-মস্তিষ্ককে যথেষ্ট আলোকিত করে। অতএব, ভবিষ্যতে আপনাদেরকেই জামা'তের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে। এখনই আপনারা (আহাদ নামা) পাঠ করেছেন, নযম শুনেছেন যাতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন, ***'আমরা যেমনই হই না কেন কাজ চলে যাচ্ছে; কিন্তু আপনাদের সময়ে জামা'তের যেন দুর্নাম না হয়।'***

আমাদের মাঝ থেকে অনেক প্রবীণ বিদায় নিয়েছেন, বর্তমান নেতৃত্বকেও একদিন বিদায় নিতে হবে। কিন্তু, যারা উন্নয়নশীল জাতি, উন্নয়নশীল জামা'ত এক প্রজন্মের বিদায়ে কখনোই সেখানে ঠাঁয় দাড়িয়ে থাকে না; বরং পূর্বসূরীদের পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর শিশু-কিশোররা যতদিন নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বারো বা তের বছরের কিশোর অথবা দশ বছরের বালক নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে না, ততদিন অগ্রগতি সম্ভব নয়। কাজেই আপনারা– যারা বলতে গেলে আজ শিশু-কিশোর, কিন্তু আপনাদের চেহারাতেই আমি আগামীর নেতা দেখতে পাচ্ছি। জামা'তের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন সেসব কর্মকর্তা দেখছি, পূর্বের তুলনায় জামা'তের উন্নতিকে অধিক ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ্।

কাজেই, আপনারা নিজেদের মর্যাদা অনুধাবন করুন; আর সর্বদা মনে রাখবেন, কোনো আহমদী শিশু, কোনো আহমদী কিশোর লক্ষ্যহীনভাবে জন্ম নেয় নি। তার জীবনের মহান একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে। এই পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া প্রতিটি মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে, খোদার অধম বান্দা হয়ে থাকা, যথাযথভাবে আল্লাহ্ তা'লার দাসত্বের দায়িত্ব পালন করা। অতএব, এখনই যদি আপনারা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হন তাহলে ভবিষ্যতে– জামা'তের উন্নতিতে, জামা'তের নেতৃত্বে, দেশের উন্নয়নে ও দেশের নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। কাজেই এ বিষয়টি সর্বদা স্মরণ রাখবেন। সাধারণত, সন্তানরা ১০-১২ বা ১৩-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত জামা'তের সঙ্গে খুবই আন্তরিক সম্পর্ক রাখে। মজলিসের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখে। জামা'তের বৈঠকাদিতে আসে আর নিয়মিত বিভিন্ন দায়-দায়িত পালন করে। কিন্তু, অনেক পিতা-মাতা আমাকে লিখেন, জানি না আমাদের সন্তানের কী হয়েছে? পনের বছরে পদার্পণ করেছে বা ষোল বছর হয়েছে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেতে আরম্ভ করেছে, বাইরের ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়তে আরম্ভ করেছে; এখন তাদের মনোযোগ না নামাযের প্রতি আছে আর না আছে মজলিসের কাজের প্রতি; আর ঘরে পিতা-মাতার কথা শোনার প্রতিও তাদের দৃষ্টি নেই। এক্ষেত্রে, পিতা-মাতার যে অপরাধ তাতো আছেই; কিন্তু সন্তানদের স্মরণ রাখা উচিত, আপনারা যদি এসব বিষয়ে চর্চা না করেন তাহলে ভবিষ্যতে জামা'তের যে নেতৃত্ব বা দায়িত্ব আসবে, কীভাবে তা পালন করবেন?

অতএব, দশ বা বারো বছর বয়স্ক প্রত্যেক কিশোর, যে ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছে– তাকে একথা স্মরণ রাখতে হবে, বিশেষভাবে আপনি যখন পনের বছরে পদার্পণ করবেন আর খোদ্দামুল আহমদীয়াতে যোগ দিবেন তখন এটি স্মরণ রাখবেন। আপনার যে preferences (বিভিন্ন অগ্রাধিকার) রয়েছে বা পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে হঠাৎ করে তা পাল্টে যাওয়া উচিত নয়। তখনও জামা'তের সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। আতফালুল আহমদীয়া সংগঠনের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক রাখুন। পিতা-মাতা এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে এমন সম্পর্ক রক্ষা করুন যদ্বারা আহমদী ও অ-আহমদীদের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

অনেক ছেলে-মেয়ে আছে, আর আমি অধিকাংশ সময় তাদেরকে জিজ্ঞেস করে থাকি। তারা ইন্টারনেট ও টিভি অনেক বেশি ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। টিভিতে যদি কার্টুন দেখতে হয় তাহলে সুস্থ মানের কার্টুন দেখুন। কার্টুন সাধারণত সুস্থ মানেরই হয়ে থাকে। কিন্তু আধা ঘন্টা, এক ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা অর্থাৎ, সময় নির্ধারিত থাকা উচিত। এমন যেন না হয় যে, ছুটির দিন অর্থাৎ, শনি-রবিবার সকালে তারা (টিভির সামনে) বসে আর সন্ধ্যে হয়ে যায়; আর সন্ধ্যায় বসলে রাত বারোটা বেজে যায়। এমনকি মা বলতে থাকেন, বাচ্চারা এসো! খাবার খেয়ে নাও। কিন্তু, এর প্রতিও তাদের কোনো খেয়াল থাকে না। কোনো কাজের কথা বললেও বাবা-মা'র প্রতি কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। অথচ টিভির সামনে বসে থেকে দেখেই যাচ্ছে।

ইংরেজিতে যাকে বলে 'ক্রেজি' বা উম্মাদ হয়ে গেছে। মাথা এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একই অবস্থা চলতে থাকে। একইভাবে, আজকাল চৌদ্দ-পনের বছরের কিশোররা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। যদি ইন্টারনেট সম্পর্কে পিতা-মাতার জ্ঞান না থাকে আর কিছু ওয়েবসাইট লক করে না দেয় তাহলে অনেক সময় সন্তানরা ভুল পথে চলে যায়। এতে পিতা-মাতা, জামা'ত এবং অঙ্গ-সংগঠন চৌদ্দ-পনের বছর বয়স পর্যন্ত যে তরবীয়ত করেছেন তা সবই ভেস্তে যায়। কাজেই, সর্বদা মনে রাখবেন, জ্যেষ্ঠরা যদি আপনাদেরকে কোনো কথা বলেন তাহলে তা আপনাদের কল্যাণের জন্যই বলেন। আপনাদের প্রতি সহানুভূতির কারণেই বলেন। আপনাদের ক্ষতির জন্য বলেন না। এটি মনে করবেন না, এ দেশে স্বাধীনতা আছে– আমাদের মন যা চায় আমরা তাই করব। এখন আমরা চৌদ্দ-পনের বছরের হয়ে গেছি, আমরা শিক্ষিত, আমাদের পিতামাতারা কী জানে? তাদের তো কোনো শিক্ষা-দীক্ষাই নেই। যদিও সেই প্রজন্মও এখন শেষ হবার পথে; বরং, অধিকাংশের পিতামাতা যারা বিগত আটাশ-ত্রিশ বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন, তারা শিক্ষিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবপ্রজন্মের মাথায় বা যুবকরা যখন টিনএজ-এ (১৩-১৯ বছর সময়কাল-অনুবাদক) পৌঁছে তখন তাদের মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়: সম্ভবত আমরাই বুদ্ধিমান আর অন্য সবাই নির্বোধ।

অথচ, ভালো কথা শুনেও এতে যারা মনোযোগ দেয় না এবং প্রবীণদের হিতোপদেশ মানে না তারাই মূলত নির্বোধ। প্রবীণরা সদা আপনাদের মঙ্গলের জন্যই কথা বলেন। সম্প্রতি যে গবেষণা হয়েছে তাতে এটি প্রমাণিত হয়েছে, লাগাতার টিভির সামনে যারা বসে থাকে বা

যেসব নোংরা চ্যানেল আছে তা লক করে রাখা উচিত। ইন্টারনেটের মতো টিভির চ্যানেলও লক করে রাখা যায়। এসব চ্যানেল দেখা উচিত নয়, আর ভুলক্রমে যদি হঠাৎ চলেও আসে তাহলে সাথে সাথে তা পাল্টে দেয়া উচিত। তবেই আপনারা, আহমদী ছেলে-মেয়েরা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। এই ভিন্নতা ছাড়া আপনাদের আর অন্যদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বিশ্ববাসীর সামনে একটি পার্থক্য সুস্পষ্ট হওয়া উচিত, এরা হচ্ছে আহমদী ছেলে-মেয়ে। এদের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ ও কাজকর্ম অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। এরা শিষ্টাচার ও নৈতিক গুণে সমৃদ্ধ।

ইন্টারনেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়– এর মন্দ প্রভাব শুধু চোখের উপরই পড়ে না বরং মস্তিষ্কের উপরও এর ক্ষতিকর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। মানসিকভাবে অনেকে একেবারেই বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়। কাজেই যদি এসব বিষয় থেকে বিরত থাকা যায় তাহলে খুবই ভালো। এছাড়া, ইন্টারনেটে যদি কিছু দেখতেই হয়, তাহলে কল্যাণজনক ও জ্ঞানমূলক অনুষ্ঠানাদি দেখুন। যেমন, এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ, এটি খুবই তথ্যবহুল। কিন্তু, যে-কোনো সাইটে চলে যাওয়া ঠিক নয়। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সের কিশোরদের কথা আমি বলছি, এমনিতেই তাদের এসব ওয়েব সাইটে যাওয়া উচিত নয়।

এছাড়া বর্তমানে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আরেকটি ব্যাধি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আর তা হল, তারা বাবা-মায়ের কাছে মোবাইল কিনে দেওয়ার বায়না ধরে। 'দশ বছর বয়স হয়ে গেলে আমাদের হাতে মোবাইল থাকা উচিত।' যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি ব্যবসা বা গুরুত্বপূর্ণ এমন কোন কাজ করছ যেজন্য তোমাকে প্রত্যেক মিনিটে ফোন করে সংবাদ নিতে হবে? উত্তরে বলে, আমাদের বাবা-মাকে ফোন করতে হয়। যদি বাবা-মাকে ফোন করা জরুরী হয় তাহলে তারা নিজেরাই এ বিষয়টি দেখবেন। তোমার ব্যাপারে তাদের যদি কোনো মাথাব্যথা না থাকে তাহলে তোমরা কেন অযথা চিন্তা করছ? কেননা, ফোনের মাধ্যমেও বিভিন্ন মন্দ অভ্যাস রপ্ত হয়। অনেক সময় দুষ্ট প্রকৃতির অচেনা মানুষ ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আর তাদের প্রলোভনে ছেলে-মেয়েরা প্রলুব্ধ হয়, এরা উঠতি বয়সী ছেলে-মেয়েদের মাঝে নোংরা অভ্যাস সৃষ্টি করে দেয়, আর এর ফলে অজ্ঞাতসারে তারা বিভিন্ন অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ে। এজন্য এই মোবাইল ফোনও অনেক ক্ষতিকর জিনিষ। এভাবে ছেলে-মেয়েরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভুল কর্মকান্ডের সাথে অনেক সময় জড়িয়ে যায়। তাই, এথেকে বেঁচে থাকা উচিত।

পূর্বে আমি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে বলেছি। এতেও কার্টুন অথবা বিভিন্ন তথ্যবহুল অনুষ্ঠানাদি দেখা উচিত। কিন্তু, অযথা ও বাজে অনুষ্ঠানাদি দেখা হতে বিরত থাকা উচিত। প্রথম কথা হচ্ছে, আপনাদের অনেক পিতা-মাতা এখানে বসে আছেন, যারা এখানে উপস্থিত আছেন তারা ভালো করে শুনে রাখুন। আর বড় বয়সের কিশোররা এমনিতেই ভালো-মন্দ বুঝতে শিখে। কাজেই যেসব নোংরা চ্যানেল আছে তা লক করে রাখা উচিত। ইন্টারনেটের মতো টিভির চ্যানেলও লক করে রাখা যায়। এসব চ্যানেল দেখা উচিত নয়, আর ভুলক্রমে যদি হঠাৎ চলেও আসে তাহলে সাথে সাথে তা পাল্টে দেয়া উচিত। তবেই আপনারা, আহমদী ছেলে-মেয়েরা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। এই ভিন্নতা ছাড়া আপনাদের আর অন্যদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বিশ্ববাসীর সামনে একটি পার্থক্য সুস্পষ্ট হওয়া উচিত, এরা হচ্ছে আহমদী ছেলে-মেয়ে। এদের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ ও কাজকর্ম অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। এরা শিষ্টাচার ও নৈতিক গুণে সমৃদ্ধ। যখনই সাক্ষাত হয় সালাম দেয়। সাক্ষাতের সময় বড়দের সামনে বিনয় প্রকাশ করে। বড়দের কথা শুনে।

এখানে আমি দু'একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছি। তারা আমাকে বলেছেন, আহমদী ছেলে-মেয়েরা স্কুলে অন্য ছেলে-মেয়েদের চেয়ে ভিন্ন। পড়াশুনার প্রতি অধিক মনোযোগী আর আচার-আচরণের দিক থেকেও যথেষ্ট ভালো। তাদের এ কথা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক। কাজেই আপনাদের এই যে পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য একে সদা ধরে রাখতে হবে। যদি ধরে না রাখেন তাহলে আহমদী হওয়া কোনোই কল্যাণ বয়ে আনবে না। আপনারা হয়ত মনে করেন, কেউ আপনাদের চিনে না; কিন্তু জগদ্বাসী আপনাদের দেখে, আপনারা কেমন– তার প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষ সদা দৃষ্টি রাখেন। আর যখন তারা কারো ভালো আচার-আচরণ দেখেন, অথবা কেউ যদি পড়াশুনায় ভালো বা মেধাবী হয় এবং পড়াশুনার প্রতি যদি একাগ্রতা দেখতে পাওয়া যায়, তখন শ্রেণী-শিক্ষক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়। আর তাদের সুদৃষ্টি আপনার জন্য উপকারী এবং আপনার পড়াশুনার উন্নতিতে সহায়ক প্রমাণিত হয়। অতএব, অধিকাংশ আহমদী ছেলে-মেয়ের মধ্যে এই যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ আছে, একে আপনারা কখনো পরিহার করবেন না। আপনাদের যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে– স্কুলেও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটা উচিত। আপনাদের শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের কাছেও

এটি সুস্পস্ট হওয়া উচিত।

আমি দেখেছি, আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় অধিকাংশ ছেলেরাও পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ দেয়; কিন্তু, এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে মেয়েরা এগিয়ে আছে। মনে রাখবেন! ভবিষ্যতে জামাতের বিভিন্ন দায়িত্ব ছেলেদের উপর অর্থাৎ, পুরুষদের উপর বেশি অর্পিত হবে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্বও আপনাদের পালন করতে হবে। তাই আপনাদেরকে মেয়েদের চেয়ে পড়াশুনায় আরো অগ্রগামী হতে হবে। মেয়েরা ঘরে বসে পড়াশুনা করতে থাকে আর ছেলেরা বাইরে চলে যায়; জিজ্ঞেস করলে বলে, ঘুরতে যাচ্ছি; কিন্তু, জানি না কোথায় যাচ্ছি। মেয়েরা কেন এগিয়ে যাচ্ছে? কারণ, তারা ঘরে থেকে পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ দেয়। আর আপনারা (ছেলেরা) চৌদ্দ বছরে পদার্পণ করেই মনে করেন, ***'আমরা বড় হয়ে গেছি, স্বাধীন হয়ে গেছি। এখন আমরা এদিক-সেদিকে ফুটবল খেলতে চলে যাব। টিভি দেখতে মন চাইলে দেখতেই থাকব।'*** এমন না করে, সব কাজের জন্যই সময় নির্ধারণ করুন। স্বাস্থ্যের জন্য খেলাধুলা করা দরকার। এখানে যেহেতু ফুটবল খেলার প্রচলন আছে তাই আমি বলছি, ফুটবল খেলুন; অথবা যে খেলা আপনার পছন্দ অবশ্যই তা খেলুন। বিকেল বেলা এক বা দেড় ঘন্টা খেলাধুলা করা উচিত। স্কুলে বিরতির সময় খেলাধুলা করা উচিত। টিভিও দেখা উচিত, এতে জ্ঞান বাড়ে। কিন্তু, এমন অনুষ্ঠান দেখা উচিত যা আপনার জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক। কিন্তু, ঘন্টার পর ঘন্টা ইন্টারনেটে বসে থাকা ঠিক নয়; কেননা, এতে অনর্থক সময় নষ্ট হয়। আর যদি ইন্টারনেট ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে বড়দের কাছ থেকে অনুমতি নিন: ***'ভালো একটি প্রোগাম এসেছে। আমরা দেখতে পারব কি?'***

একইভাবে, শখ পূরণার্থে দশ বছরের ছেলে-মেয়েদের হাতে মোবাইল ইত্যাদি দেয়া একেবারেই অনুচিত। পিতা-মাতার উচিত নয় সন্তানদের এমন আবদার পুরণ করা।

কাজেই আপনারা সর্বদা স্মরণ রাখুন! যেসব বিষয়ের প্রতি আমি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। যদি ভারসাম্য না থাকে আর কোনো দিকে বেশি ঝুঁকে পড়া হয়, আর কোনো দিক উপেক্ষিত হলে, দু'টোই ভুল। যদি ভারসাম্য রক্ষা করেন তাহলে আপনাদের জীবন সদা ভালো কাটবে, আর বড় হয়ে আপনি একজন ভালো মানুষ হতে পারবেন। সেই মানুষ হতে পারবেন যার প্রয়োজন রয়েছে জামা'তের। অতএব, আপনি একজন আহমদী সন্তান আর আপনাকে অন্যের চেয়ে ভিন্ন হতে হবে– এ কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখুন। সকল কাজের ক্ষেত্রে আপনি অন্যের চেয়ে ভালো এটি আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক আহমদী সন্তানকে স্কুলে শীর্ষস্থানে থাকতে হবে। পড়াশুনার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। পারিবারিক সমস্যাদি বা অস্থিরতা যেন পড়াশুনার প্রতি মনোসংযোগে চির ধরাতে না পারে। আপনারা নিবিষ্ট মনে পড়াশুনা করতে থাকুন।

আরেকটি রোগ বা ব্যাধি, যা শৈশবে অনুভূত হয় না অথচ তামাশাচ্ছলে শৈশবেই মানুষ এ ধরনের কথা বলে থাকে; অনেক সময় বড়রাও সাবধানতা অবলম্বন করে না, বরং ছোটদের দেখাদেখি করে বসে, আর তা হলো মিথ্যা বলার ব্যাধি। ভুল কথা বলার রোগ। ঠাট্টা করে বলে, আমি এভাবে বলেছি, কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি তদ্রূপ নয়। আর এভাবেই মানুষের মাঝে মিথ্যা বলার বদভ্যাস গড়ে উঠে। অতএব, তামাশাচ্ছলেও কোনো আহমদী সন্তানের মিথ্যা বলা উচিত নয়।

যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, পিতামাতার সম্মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'লা পিতামাতাকে সম্মান করার এবং তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের জন্য দোয়া করার নির্দেশ রয়েছে, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমার প্রতিপালন করেছেন, আমার জন্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন এবং এখনও করছেন। আপনাদের পিতামাতা যা উপার্জন করছেন তা আপনাদের পিছনেই ব্যয় করছেন, আপনাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য খরচ করছেন, আপনাদের পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য খরচ করছেন। তাই সন্তানের উচিত তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। দশ-এগারো বছরের বালকদের বুদ্ধি-বিবেচনার বয়স হয়ে যায়। আর চৌদ্দ-পনের বছরের তিফলের খুব ভালোভাবেই জ্ঞান থাকা উচিত: আমার প্রতি পিতামাতার এটিও একটি অনুগ্রহ, তারা আমার খরচ বহন করছেন, আমার সকল চাহিদা পূর্ণ করছেন,

সম্প্রতি যে গবেষণা হয়েছে তাতে এটি প্রমাণিত হয়েছে, লাগাতার টিভির সামনে যারা বসে থাকে বা ইন্টারনেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়– এর মন্দ প্রভাব শুধু চোখের উপরই পড়ে না বরং মস্তিষ্কের উপরও এর ক্ষতিকর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। মানসিকভাবে অনেকে একেবারেই বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়। কাজেই যদি এসব বিষয় থেকে বিরত থাকা যায় তাহলে খুবই ভালো। এছাড়া, ইন্টারনেটে যদি কিছু দেখতেই হয়, তাহলে কল্যাণজনক ও জ্ঞানমূলক অনুষ্ঠানাদি দেখুন। যেমন, এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ, এটি খুবই তথ্যবহুল। কিন্তু, যে-কোনো সাইটে চলে যাওয়া ঠিক নয়। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সের কিশোরদের কথা আমি বলছি, এমনিতেই তাদের এসব ওয়েব সাইটে যাওয়া উচিত নয়।

এ কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখুন। সকল কাজের ক্ষেত্রে আপনি অন্যের চেয়ে ভালো এটি আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক আহমদী সন্তানকে স্কুলে শীর্ষস্থানে থাকতে হবে। পড়াশুনার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। পারিবারিক সমস্যাদি বা অস্থিরতা যেন পড়াশুনার প্রতি মনোসংযোগে চির ধরাতে না পারে। আপনারা নিবিষ্ট মনে পড়াশুনা করতে থাকুন।

আমার পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন, স্কুলের বেতন ইত্যাদি দিচ্ছেন, স্কুলে যাবার পরিবহন খরচ যোগাচ্ছেন। এ কারণে আপনারা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। আর আল্লাহ্ তা'লা এবং মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের প্রতি পিতামাতার যে অনুগ্রহ তার বিনিময় বা ঋণ তোমরা কখনোই পরিশোধ করতে পারবে না। কিন্তু, সর্বদা তাঁদের সাথে ভালো এবং অনুগ্রহসূলভ আচরণ করা উচিত। আর সদা তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন, হে আল্লাহ্! তাঁরা যেভাবে আমাদের প্রতি দয়া করে তুমিও তাঁদের প্রতি সর্বদা দয়া করতে থাক। যদি এই দোয়ার অভ্যাস গড়ে উঠে তাহলে আপনাদের মনে পিতা-মাতার জন্য সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে, আর আপনারা দেখবেন, আল্লাহ্ তা'লাও এতে সন্তুষ্ট হবেন। আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির কারণে আপনারা আরো উত্তম মানুষে পরিণত হতে পারবেন।

সাত বছর থেকে পনের বছর বয়সী ছেলেরা আতফালুল আহমদীয়ার সদস্য। সাত বছর থেকে দশ বছর বয়সীদের নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে। অভ্যাস করানো উচিত আর সন্তানদেরও নামাযে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। এছাড়া দশ-বারো বছরের বালকদের কিছুটা শাসন করারও নির্দেশ আছে। যদি পিতা-মাতা আপনাদেরকে নামায পড়তে বলেন এবং এ ব্যাপারে কিছুটা কড়াকড়ি করেন তাহলে একে অন্যভাবে নেয়া উচিত নয়। কেননা, এটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ। এই বয়সে যদি নামাযের অভ্যাস গড়ে উঠে তাহলে ভবিষ্যতে এই অভ্যাস স্থায়ী হবে। আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন, যারাই নামাযে অভ্যস্ত, যাদের পাঁচবেলা নামায পড়ার অভ্যাস রয়েছে তাদের মধ্য হতে অধিকাংশেরই শিশুকালে নামায পড়ার শখ ছিল। তারা তাদের শিশুকাল ভালো পরিবেশে কাটিয়েছেন; আর যখন যৌবনে পদার্পণ করেছেন তখনও ভালো পরিবেশ পেয়েছেন। অনেকে শিশুকালে ভালো পরিবেশে বেড়ে ওঠে, জামাতের সেবাও করে, আতফালুল আহমদীয়ার বিভিন্ন সভায়ও যোগ দেয়, মসজিদেও আসে; কিন্তু চৌদ্দ-পনের বছর হয়ে গেলে মনে করে এখন আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি। এর বিপরীতে, অনেকে শৈশবে গড়ে ওঠা নামাযের অভ্যাস ধরে রাখেন। কিন্তু যারা শিশুকালে এর প্রতি মনোযোগ দেয় না তারা বড় হয়েও এ বিষয়ে মনোযোগ দেয় না। একজন মুসলমানের জন্য নামায ফরয, আর পুরুষদের জন্য মসজিদে গিয়ে নামায পড়া একান্ত আবশ্যক। কাজেই, যতটুকু সম্ভব দশ-বারো বছর বা এর চেয়ে বড় বয়সের তিফলদের পিতার সাথে নামায সেন্টারে গিয়ে নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত।

এরপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পবিত্র কুরআন পাঠ করা। অনেক শিশু আকাঙ্ক্ষা রাখে আর আমাকে দিয়ে 'আমীন'ও [শিশুরা প্রথমবার যখন সমগ্র কুরআন পাঠ সমাপ্ত করে তখন যে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে তাকে 'আমীন' বলা হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন– অনুবাদক] করানো হয়। সাধারণত ছয়-সাত, আট বা নয় বছর বয়সে আমীন অনুষ্ঠান হয়ে যায়। অনেকে আবার পাঁচ বছর বয়সেই প্রথম কুরআন পাঠ শেষ করে। এ পর্যায়ে আমি যেসব পিতা-মাতা এখানে বসে আছেন তাদেরকে বলব, এরপর সন্তানদেরকে কুরআন পড়ানোর প্রতি আর মনোযোগ দেয়া হয় না। কাজেই, পিতা-মাতাও মনোযোগ দিন আর এগারো বছরের বরং নয় বছর বয়সী সন্তানরা স্বয়ং মনোযোগ নিবদ্ধ করুন।

যদি একবার কুরআন খতম করেন তাহলে প্রতিদিন কমপক্ষে অর্ধেক রুকূ পাঠ করুন আর কুরআন পাঠের অভ্যাস সৃষ্টি করুন। যদি কুরআন পাঠে অভ্যস্ত হন তাহলে ধীরে ধীরে আপনারা এর মর্ম বুঝতেও সক্ষম হবেন। আর যখন কুরআন বুঝতে সক্ষম হবেন তখন একজন আহমদী মুসলমানের কী কী দায়িত্ব রয়েছে তাও জানতে পারবেন। এগুলো তাকে পালন করতে হবে যাতে সঠিকভাবে ধর্মসেবা করতে পারে আর সমাজের যে প্রাপ্য অধিকার রয়েছে তাও প্রদান করতে পারে, আর আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার প্রদানেও সক্ষম হয়। রাষ্ট্রের অধিকারও প্রদান করতে পারে। জ্যেষ্ঠদের অধিকার দিতে পারে আর নিজের সঙ্গী-সাথীর অধিকার দিতেও সক্ষম হয়।

অতএব, পবিত্র কুরআন পাঠ একান্ত আবশ্যক; আর তের-চৌদ্দ বছরের কিশোরদের অনুবাদসহ কুরআন পড়ার চেষ্টা করা উচিত। এখন থেকেই যদি আপনাদের মধ্যে এই উত্তম অভ্যাস সৃষ্টি হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আপনারা বড় হয়ে এমন মানুষে পরিণত হতে পারবেন যাদের সম্পর্কে বলা যাবে, এদের ভেতর এমনসব যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে যে, এখন জামা'তের উন্নতিতে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। আর ইনশাআল্লাহ্ তা'লা সেই উন্নতির অংশ হতে পারবে যা আল্লাহ্ তা'লা জামাতের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন।

কাজেই আপনারা সদা এসব বিষয় স্মরণ রাখুন! নামায পড়ার বিষয়ে মনোযোগী হোন। নিজের আচার-আচরণের ব্যাপারে যত্নবান হোন। যথারীতি পবিত্র কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ দিন। স্কুলের পড়াশুনার ব্যাপারে যত্নবান হোন। জ্যেষ্ঠদের সম্মানের ব্যাপারে মনোযোগ দিন। আমি দোয়া করি, আমাদের ছেলে-মেয়েরা যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে শিখে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এগুলো মেনে চলার সৌভাগ্য দিন, আমীন।

অনুবাদঃ মৌলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের
বাংলা ডেস্ক, লন্ডন

সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য

আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক

[বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ওয়াজ ব্যবসায়ী মৌলানা দিলওয়ার হুসেন সাঈদী বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ করার প্রাক্কালে সস্তা বাহবা কুড়াবার জন্য এই কথা বলে বেড়াতো যে, সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব জামা'তে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত গোলাম আহমদ (আ.)-কে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন এবং তাতে মির্যা সাহেব নাকি পরাজয় বরণ করেছেন। বাংলাদেশের সরল সোজা ধর্মভীরু মানুষের নিকট এই ডাহা মিথ্যা এবং ভুল তথ্য প্রচার করে তিনি তাদেরকে বোকা বানাতে চেয়েছেন। ঐ ঘটনার প্রকৃত তথ্য জনসমক্ষে প্রচার করা আমরা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি। তাই নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য জনসাধারণের অবগতির জন্য পেশ করা হল]

আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব ১৮৯২ ইং সালে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১২ বৎসর বয়সে তার পিতার সঙ্গে তার নিজ এলাকা পাঞ্জাব প্রদেশের জেলা গুজরাটের অন্তর্গত নাগড়িয়ায় আগমন করেন। অমৃতসরের 'খায়রুদ্দীন' নামক জামে মসজিদ সংলগ্ন আরবী মাদ্রাসায় কিছুকাল শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২১-২২ ইং সনে খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত মসজিদের ইমাম থাকাকালীন তিনি বেশ জোরালো ও উদ্দীপক বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ধন-সম্পদ ও পরিজন ত্যাগ করে হিজরত করতে উদ্বুদ্ধ করেন যার ফলে সহস্র সহস্র মুসলমান কারাগারে বন্দী হন। সেই খেলাফত আন্দোলনকালে 'আহ্‌রার পার্টির' অধিনায়ক মওলানা মোহাম্মদ আলী জাওহার তাকে পরামর্শ দিলেন যে, 'তুমি ভাষার ওপর যে দক্ষতা অর্জন করেছ, এটা বিধাতার এক বিশেষ দান এবং তাঁর এক নেয়ামত, কিন্তু ইহা এক অতি বিপজ্জনক নেয়ামত, কারণ, এতদ্বারা নানা জিজ্ঞাসা ও তোমার কৈফিয়ত দানের বিষয়টিও বিরাট আকার ধারণ করেছে তুমি এটাকে তোমার হক্ পথে ব্যবহার করবে, দুই জাহানের সফলতা অর্জন করবে। কিন্তু এই দক্ষতাকে অন্যায় পথে ব্যবহার করা হলে খোদার হাজার বান্দাকে পথভ্রষ্ট করার জন্য এটা যথেষ্ট।' [হাবীবুর রহমান খাঁ কাবলী রচিত সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) চরিত']

উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতির আলোকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও মাহ্‌দী মাহূদ আলায়হেস সালাতো ওয়াস সালাম (১৮৩৫-১৯০৮ ইং) এর সঙ্গে সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেবের সাক্ষাৎ ও মুনাযেরা করার কোন প্রশ্নই উঠে না, কারণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব কেবলই এক কিশোর আর তখন ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষিত ও খ্যাতিমান হাজার হাজার আলেম ফাযেল লোকের মান্যবর ধর্মীয় এক নেতার সঙ্গে, যিনি ইসলামী দর্শন, তফসীর কুরআন, ফিকাহ্, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ৮৮টি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার সাথে ওই বিষয়ের অকাট্য প্রমাণাদিসহ মুনাযেরা করাতো দূরের কথা, ভালরূপে কিতাব ধরা এবং পড়াও হয়তো তিনি তখন শিখেন নি। তা ছাড়া জনাব সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেবের ভক্ত ও শিষ্যগণের মধ্যে যারা জনাব শাহ্ সাহেবের জীবন চরিত লিখেছেন, তারা নিজেদের লেখায় কোথায়ও এইরূপ উল্লেখ করেন নি যে, শাহ্ সাহেব কোন দিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শাহ্ সাহেব হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর ওফাতের ১২ বৎসর পর অর্থাৎ ১৯২০ ইং

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও মাহ্‌দী মাহূদ আলায়হেস সালাতো ওয়াস সালাম (১৮৩৫-১৯০৮ ইং) এর সঙ্গে সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেবের সাক্ষাৎ ও মুনাযেরা করার কোন প্রশ্নই উঠে না, কারণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব কেবলই এক কিশোর আর তখন ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষিত ও খ্যাতিমান হাজার হাজার আলেম ফাযেল লোকের মান্যবর ধর্মীয় এক নেতার সঙ্গে, যিনি ইসলামী দর্শন, তফসীর কুরআন, ফিকাহ্, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ৮৮টি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার সাথে ওই বিষয়ের অকাট্য প্রমাণাদিসহ মুনাযেরা করাতো দূরের কথা, ভালরূপে কিতাব ধরা এবং পড়াও হয়তো তিনি তখন শিখেন নি।

সালের পরে জনসম্মুখে উপস্থিত হয়ে আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশের মৌলানা দিলওয়ার হুসেন সাঈদীর বিনা সনদের এই উক্তি "হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর সাথে সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব মুনাযেরা করেছিলেন"–ইতিহাস সম্বন্ধে তার জ্ঞানের দৈন্যতা প্রকাশ করে জনসমক্ষে তার নিম-মোল্লা ভাবমূর্তি উন্মোচন করে দিয়েছে। সস্তা বাহ্বা কুড়ানোর অপচেষ্টার পরিণাম এই রকমই হয়ে থাকে।

সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব একজন সুবক্তা ছিলেন বটে, কিন্তু কুরআন হাদীসের আলোকে যুক্তি তর্কের ময়দানে কোন আহমদী আলেমের সঙ্গে কোন দিন তিনি মোনাযেরা করেন নি। আহরার পার্টির নেতাগণ, যাদের মধ্যে সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব হলেন প্রথম সারির নেতা পরিষ্কার ভাবে তিনি ঘোষণা করেছেন,

'কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে আমাদের কোন মোকাবেলা নেই। ধর্মীয় বিষয়ে উলামাগণ তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করেছেন। তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ কেবল রাজনৈতিক যুদ্ধ।' (সাপ্তাহিক আহলে হাদীস, ২৯ নভেম্বর, ১৯৩৫ এবং সাপ্তাহিক 'চাটান' এর সম্পাদক আগা আব্দুল করিম শোরশ কাশ্মীরী রচিত 'সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী চরিত')

সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব অবশ্য একজন মঞ্চবীর ছিলেন; কিন্তু তার মধ্যে আদব-কায়দা, রূহানীয়ত এবং গাম্ভীর্যের বেশ অভাব। অনেক সময় তিনি নিজ বক্তৃতায় এমন আবোল-তাবোল বকতেন যা শুধু কেবল ঘৃণা বলে গণ্য হত না বরং স্বয়ং তার বিরুদ্ধেও যেত। এইরূপ বহু ঘটনা ঘটেছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটি এখানে উল্লেখ করা গেল :

১৫ মে ১৯৩৫ ইং সালের কথা; লাহোরে এক সভায় জনাব শাহ্ সাহেব জামা'তে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন. 'খুদানে বুখারীকো মির্যায়ীওকে উপার দাজ্জাল বানাকার বিঠা দিয়া হে'

অর্থাৎ খোদা বুখারীকে মির্যায়ীদের ওপর দাজ্জাল করে বসিয়েছেন। (লাহোর হতে প্রকাশিত 'এহ্‌সান ও দৈনিক আল ফযল, ২৩ মে ১৯৩০)

দাজ্জাল সম্বন্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদবধি জমীন ও আসমান সৃষ্টি হয়েছে তদাবধি দাজ্জাল অপেক্ষা বড় ফিৎনাবাজ জগতে আর হয়নি এবং ভবিষ্যতে কিয়ামতকাল পর্যন্তও হবে না, যার ফিৎনা ও অপকর্ম হতে সকল নবী আশ্রয় চেয়েছেন এবং নিজ নিজ উম্মতকে সতর্ক করেছেন এবং স্বয়ং নবী করীম (সা.) তাঁর নিকট হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চেয়েছেন এবং নিজ উম্মতকে তার ফিৎনা হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। এ অবস্থায় তার নিজেকে দাজ্জাল বলা জনাব শাহ্ সাহেবের চরম খামখেয়ালী ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক।

জনাব শাহ্ সাহেবে অন্য এক উপলক্ষে বলেছেন :

'এই অভিযানে শূকরও যদি আমার সাহায্য করে তাহলে আমি তাদের মুখ চুম্বন করব।'

[আগা আব্দুল করীম শোরশ কাশ্মীরী রচিত- সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী চরিত, ২৯-৩০ পৃ:]

অভিযান যত বড়ই হোক না কেন, নির্লজ্জ, ঘৃণা ও আল্লাহ্‌র হারাম করা পশু শূকরের মুখ চুম্বন করা কোন ক্রমেই একজন মুসলমানের জন্য বৈধ হতে পারে না; কিন্তু শাহ্ সাহেব এই অবৈধ ঘৃণ্য কাজ করার জন্যও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। এর দ্বারা শাহ্ সাহেবের অবৈধ ও ঘৃণ্য কাজ করার প্রবণতা দৃষ্ট হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে ইরশাদ করেছেন : 'তুমি লক্ষ্য করনি যে কিরূপে আল্লাহ্ পবিত্র কথা পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় বলে উপমার বর্ণনা করেছেন যার শিকড় (যমীনে) সুদৃঢ় এবং এর শাখা প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত: তা সদা এর প্রভুর আদেশে ফলদান করে। এবং মন্দ কথা মন্দ বৃক্ষের ন্যায় বলে উপমার বর্ণনা করেছেন, যাকে

ভূপৃষ্ঠ হতে উৎপাটন করে ফেলে দেয়া হয়েছে, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। যারা ঈমান আনে, আল্লাহ্ তাদেরকে সুদৃঢ় কালাম দ্বারা ইহজীবনে ও পরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন' (ইবরাহীম : ২৫-২৮)।

ওপরে উল্লিখিত আয়াতগুলোর আলোকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মু'মিনদের কথায় আল্লাহ্ তা'লা হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী শক্তিদান করেন এবং তা শ্রবণে মানুষ নিজের মধ্যে নেক পরিবর্তন আনয়ন করে। সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব অবশ্য সুবক্তা ছিলেন; কিন্তু যেরূপ ভাবে যাদুকর ও কৌতুকাভিনেতারা নিজ বিস্ময়কর যাদুমন্ত্র ও কৌতুক দ্বারা দর্শকমন্ডলীকে বিস্মিত ও অভিভূত করে ফেললেও তারা তাদের মধ্যে কোন নেক পরিবর্তন চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করতে পারে না; তদ্রুপই সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের অবস্থা ছিল। শ্রোতামন্ডলী তার বক্তৃতা শুনে অবশ্য অভিভুত হয়ে পড়ত; এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নয়। তারা তার কথা এক কান দিয়ে শুনত, অপর কান দিয়ে বের করে দিত, অন্তরে তাদের কিছুই প্রবেশ করত না এবং কখনও তারা তাকে কোন আমল দিত না। দুই একটি ঘটনা উল্লেখ করলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হয়ে যাবে।

১৭ই নভেম্বর ১৯৩৫ ইং সালে আহরার পার্টির অধিনায়ক এবং আমীরে শরীয়ত সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব অমৃতসরস্থ খায়রুদ্দীন জামে মসজিদে বক্তৃতা দান করতে গিয়ে বলেন :

হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদেরকে ছাড়ব না, মৃত্যুর পূর্বে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছাড়ব না; কারণ আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্র তোমাদের নিকট হতে চাঁদা আদায় করবে। অবস্থা যখন এরূপ যে, আমি তোমাদেরকে না ইহকালে ছাড়ব না পরকালে, তখন তোমাদেরকে চাঁদা দিতে কোন আপত্তি করা উচিত নয়। (এই কথা বলে তিনি ডানে বামে তাকাতে আরম্ভ করলেন; কিন্তু কেউই তার ভিক্ষা পাত্রে এক কড়িও প্রদান করল না) এবার তিনি বলতে লাগলেন, 'তোমরা কিছু বল না কেন? তোমরা চুপ হয়ে গেলে কেন? নিজেদের থলি ঢিলা কর।' তখন লোক ধীরে ধীরে চম্পট দিতে আরম্ভ করল। (দৈনিক আলফযল, ২১ নভেম্বর, ১৯৩৬ইং)

১৯৩৫ইং সালের মার্চ মাসে তৎকালীন সরকার আহ্‌রার পার্টি ও এর অধিনায়ক সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেবের বিরুদ্ধে মুসলমান দুই দলের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে একটি মোকদ্দমা দায়ের করে। সেই মোকদ্দমার ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে জামা'তে আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেবকেও গুরুদাসপুর ডিস্ট্রিকট কোর্টে তিন দিন হাজির হতে হয়। তখন বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকগণ যাদের মধ্যে গয়ের আহমদী মুসলমান এবং অমুসলমানও ছিলেন, নিজ নিজ পত্রিকার যে বিবরণী প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি হতে দুই একটির উল্লেখ করা গেল :

একজন মুসলমান সাংবাদিক–'আহরার ইহা মনে করে বা অন্তত: অন্যের ওপর ইহা প্রকাশ করে যে, তারা আহমদীয়াতকে অদূর ভবিষ্যতে নির্মূল করে ফেলবে। তারা এই প্রকারের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মুসলমানদের নিকট হতে বহু টাকা আদায় করছে। কিছু দিন পূর্বে কাদিয়ানে আহরার কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হল, এতেও একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছিল যাতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করানো যেতে পারে যে, কাদিয়ানে আহরারদের একটি কনফারেন্স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আহমদীরা কাদিয়ান ছেড়ে পলায়ন করবে। এইরূপে সমস্ত ভারতবর্ষ হতে আহমদীয়াতের মূল উৎপাটন করে দেওয়া হবে। কিন্তু জনৈক বুযুর্গ ঠিকই বলেছেন : 'আমরা (জমীনে) অন্য কিছু ধারণা করি এবং স্বর্গে অন্য কিছু ফয়সালা হয়ে থাকে'।

আহরারদের সকল পরিকল্পনা বৃথা গেল। আহরার কনফারেন্সের সভাপতি, আমীরে শরীয়ত, শেরে খেলাফত, বীরে কংগ্রেস এবং আহরার কনফারেন্সের আহ্বায়ক মৌ: সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারীর বিরুদ্ধে সরকার দুই দলের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টি করার অভিযোগে মোকদ্দমা চালালো এবং মৌ: সাহেব অপরাধী সাব্যস্ত হলেন।

তিন দিন খলীফা সাহেবেরও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হল। এই তিনদিন গুরুদাসপুর আহমদীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, শহর, অফিস, আদালত, রাস্তাঘাট এবং বাজার ইত্যাদি যেদিকে নযর পড়ত আহমদী আর আহমদীদেরই দেখা যেত। আহমদীদের শৃংখলা, একতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের নমুনা দেখে লোক অভিভুত হয়ে পড়ল। খলীফা সাহেবের কোর্টের সাক্ষ্য দান, মহৎ চরিত্র, তাঁর নূরানী চেহারা এবং তাঁর প্রতি আহমদীদের পরম শ্রদ্ধা, ভক্তির, আন্তরিকতা ও আত্মনিবেদনের আদর্শ দেখে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধবাদীগণ বিস্মিত হয়ে পড়ল। খলীফা সাহেব প্রতিদিন কোর্টে সাক্ষ্য দেওয়ার পর শেখ মোহাম্মদ নসীব সাহেবের বিশাল বাড়ির সম্মুখস্থ লেনে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দান করতেন। শেষ দিনের সভাটি অসাধারণ এবং আধ্যাত্মিক জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। সহস্র সহস্র আহমদী ছাড়াও বহু গয়ের আহমদী মুসলমান, হিন্দু ও শিখ সাহেবানও উপস্থিত ছিলেন।

আমরা সরেযমীনে উপস্থিত হয়ে এই সব দৃশ্য অবলোকন করলাম, আরও লক্ষ্য করলাম গ্রামে গঞ্জে লোক-মুখে আহমদীদের প্রশংসা-চর্চা। অনেক লোককে এই বলতে শুনেছি যে, আহরারীগণ অযথা আহমদীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অন্তরে ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে, অথচ তারা খাঁটি ইসলামী আচরণ রীতিনীতি, নামায ও কালাম পরস্পর মহব্বত ও ভ্রাতৃত্ববোধে অনুপ্রাণিত; অথচ অন্য মুসলমানগণ এই নেয়ামত হতে বঞ্চিত।

সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য বিষয়টি এই যে, সাক্ষ্য দানের সেই তিন দিনে প্রায় একশ জন লোক বয়আত করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হয়েছে। কয়েকজন আহমদী অমৃতসর রেল ষ্টেশনে সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ (বুখারী) সাহেবকেও সরাসরি বলল যে, 'আপনাদের চেষ্টার ফলে আমাদের পক্ষে উত্তম ফল প্রকাশ পাচ্ছে যার জন্য আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।' এর উত্তরে মৌলবী সাহেব বললেন, জামা'ত আহমদীয়ার সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। তবে মির্যা সাহেব জিহাদ সম্পর্কে যে শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা একে খুবই অপসন্দ করি। যদি খলীফা সাহেব এর সংশোধন করে দেন, তা হলে অন্যান্য বিষয় বাদ দেয়া যেতে পারে। ('দৈনিক আল ফযল, কাদিয়ান ৫ এপ্রিল ১৯৩৫)

লাহোর হতে প্রকাশিত 'ইহসান; ২৫ মার্চ ১৯৩৫ ইং এর সংখ্যা লিখেছে :

'কাদিয়ানের খলীফা সাহেব এক হাজার মুরীদকে স্পেশাল ট্রেনে নিয়ে

(গুরুদাসপুর) উপস্থিত হলেন। প্রায় চার হাজার মুরীদ আশপাশ হতে উপস্থিত হল। মির্যায়ী ক্যাম্পে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল।'

প্রকাশ থাকে যে মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব নাযের, দারুয যিয়াফত ৮০টি বড় পাতিল, কয়েক শ' বালতি, বাসন-পত্র ডিশ, গ্লাশ, পানির হাম্মম, ল্যাম্প, মাদুর, দস্তরখানা এবং শামিয়ানা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামাদি কাদিয়ান হতে গুরুদাসপুর নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে প্রায় দশ হাজার লোকের জন্য অতি সুস্বাদু খাবার রান্না করা হয়েছিল, এর প্রতিই "ইহ্‌সান" পত্রিকা ইঙ্গিত করেছে যে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। সেই সময় কাদিয়ান, বাটালা, অমৃতসর, লাহোর, মুলতান, শেখপুরা গুজরাট, ফিরুজপুর, গুজরানওয়ালা, কাশ্মীর এবং সীমান্ত প্রদেশ হতে আহমদী উকিল ব্যরিষ্টার এবং উচ্চ শ্রেণীর সামারিক ও সিভিল অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন, (তারিখে আহমদীয়াত, ৮ম খন্ড, ১৫৯ পৃঃ)।

রঙ্গীন পত্রিকার সম্পাদক সরদার অর্জুনসিং (যিনি তৎকালীন সুলেখকগণের মধ্যে অন্যতম লেখক ছিলেন) 'খলীফায়ে কাদিয়ান' নামক নিজ গ্রন্থে লিখেছেন :

এই কথা সকলেই জানেন যে, মৌলবী আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব দাবী করেন যে, তিনি ভারতবাসী অষ্ট কোটি মুসলমানদের প্রতিনিধি। পক্ষান্তরে কাদিয়ানের খলীফার অনুসারী প্রায় এক লক্ষ, যাদের মধ্যে কেবল প্রায় ৫৫ হাজার পাঞ্জাবে বসবাস করে। কিন্তু পাঠকবৃন্দ! এটা শুনে বিস্মিত হবেন যে, সেই তারিখগুলোতে যখন খলীফা সাহেব সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কোর্টে উপস্থিত হতেন তখন প্রায় দশ হাজার আহমদী তাঁর পার্শ্বে উপস্থিত থাকত। কিন্তু গয়ের আহমদী মুসলমান মৌলবী আতাউল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের পার্শ্বে একশও উপস্থিত থাকত না। এ দ্বারা খলীফা সাহেব ও মৌলবী সাহেবের মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তির তুলনা করা যেতে পারে। এমন একটি জামা'ত যার সদস্যদের সংখ্যা পাঞ্জাবে কেবল ৫৫ হাজার, খলীফা সাহেবের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁর দর্শন লাভ করার জন্য দশ হাজার সংখ্যায় উপস্থিত হয়।

অপরপক্ষে এমন জামা'ত যাদের সংখ্যা কেবল গুরুদাসপুরেই দশ হাজারের অধিক, তাদের নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে একশ' জনও উপস্থিত হয় না। অথচ প্রথমোক্ত নেতা কেবল সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এবং অপর বুযুর্গের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চলতেছিল। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মৌলবী সাহেবের দাবী সত্যতার উপর নয়। পক্ষান্তরে খলীফা সাহেবের মুরীদগণ তাঁর জন্য সত্যিকার অন্তঃপ্রাণ।

এই দৃশ্য দেখে অন্তর অভিভুত হয়ে পড়েছিল। আমি স্বয়ং শেষ দিন উপস্থিত ছিলাম। এই খেয়াল আমাকে পুনঃপুনঃ ব্যাকুল করে তুলল যে, এই ব্যক্তি প্রথম জন্মে কি পুণ্যকর্ম করেছিলেন যার বিনিময়ে তিনি আজ বিস্ময়কর প্রকৃষ্ট স্থান অর্জন করেছেন, কেবল আমিই এই দৃশ্য দেখে অবাক ছিলাম না বরং গয়ের আহমদী মুসলমানগণও এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছিল। আমি বাজারের লোকদেরকে এই কথা বলতে শুনেছি, কেউ জামা'তের শৃঙ্খলার প্রশংসা করছিল, কেউ বাহ্যিক শান ও শওকতের প্রশংসায় মুখর ছিল; কেউ মুরীদদের আত্মনিবেদন এবং শ্রদ্ধা-ভক্তির গুণ গাচ্ছিল।

কেউ বলছিল আহমদীগণ ইবাদত এবং ইসলামের শিক্ষার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছে....আমি অবাক ছিলাম যে, নিজেদের মত একটি মানুষের দর্শন লাভ করার জন্য এই যে সহস্র সহস্র মানুষ ব্যাকুল হয়ে ছুটাছুটি করছে, তারা কি ভ্রান্তিতে আছে, না জালিয়াতের শিকার হচ্ছে? যে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষিত, সমঝদার, বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ লোক বিদ্যমান।

আমি চিন্তা করি, মিথ্যা ও প্রতারণা কি এত দীর্ঘকাল ফল প্রদান করতে পারে? দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর (বর্তমানে একশ' বৎসরেরও অধিক–অনুবাদক) হতে চলেছে, যখন এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিজেকে দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করেছেন। যদি তিনি একজন প্রতারকই হতেন তা হলে প্রতারকের কি এতটুকু ক্ষমতা থাকে যে, সে অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিস্তৃত হতে থাকবে? এটা নিশ্চিত সত্য যে, ধোকাবাজী ও প্রতারণার মধ্যে এইরূপ ক্ষমতা আদৌ থাকতে পারে না।'

('খলীফায়ে কাদিয়ান' ২০-২৪ পৃঃ)

মৌলনা দিলওয়ার হোসেন সাহেব! একেই বলা হয় ***'আল কাওলুস সাবেতু'*** যদ্বারা আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মধ্যে অসাধারণ নেক পরিবর্তন সৃষ্টি করেন, যার ফলে তারা আল্লাহ্‌র পথে সবকিছু কুরবান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং এটাকে বলা হয় ***'আল ফাজলু'*** (প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব) যার সম্বন্ধে শত্রুও সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়।

১৯৩৫ইং সালে প্রকাশিত মুসলিম ও অমুসলিম পত্র পত্রিকা এবং বই পুস্তক থেকে বুঝা যায় যে, সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব সেই সময় পর্যন্তও একজন সাধারণ মৌলবী সাহেব বলেই আখ্যায়িত হতেন। এরও ৩৫ বৎসর পূর্বে শাহ্ সাহেবের বয়স যখন দশ বৎসর ছিল, তখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব মসীহ্ ও মাহ্‌দী মাহুদ আলায়হেস সালামের সঙ্গে তার বাহাস করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

সেই বয়সেতো মানুষ 'ইসলাম' এর ***'আলিফ'*** এবং 'কুরআন' এর ***'কাফ'*** এবং (বিসমিল্লাহ্) এর 'বে'র তাৎপর্যও বুঝতে পারে না; তখন 'নবুওয়াত' এর ন্যায় সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর যুক্তি-তর্কও ও দলিল প্রমাণ উত্থাপন পূর্বক বাহাস করার কথা মৌঃ সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেবের প্রতি আরোপ করা আজগুবী, অবান্তর এবং অলীক কথা বৈ কিছু নয়।

১৯৩৫ইং সাল পর্যন্ত শাহ্ সাহেবের অবস্থা এইরূপ ছিল যে, অন্যেরা তো দূরের কথা স্বয়ং তার মুরীদরাও তার কথাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি এবং কোন আমলও দেয়নি। তাদের নিকট শাহ্ সাহেব ভিক্ষা চাইলে ভিক্ষা পাত্রে কেউ এক কড়িও দেয়নি। গুরুদাসপুর জেলা-আদালতে আসামী হিসেবে পেশ হওয়ার মহাবিপদের সময়ও এই দশ কোটি লোকের নেতার সঙ্গে একশ' জন লোকও সঙ্গ দেয়নি। এর সম্পূর্ণ বিপরীতে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা কয়েক লক্ষ টাকা হাজির করে দেয়।

জামা'তের আর্থিক কুরবানীর স্পৃহা ও আবেগ এত উচ্চ মার্গে পৌঁছেছে যে এই জামা'ত প্রতি বছরে কয়েক শ' কোটি টাকার বাজেট অনুমোদিত হয়। শুধু করাচী

জামা'তেরই বৎসরে দুই কোটি টাকা অনুমোদন করা হয় বিশ্বে এইরূপ বহু জামা'ত রয়েছে।

জামা'তে আহমদীয়ার খলীফা সাহেব শুধু সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যখন কোর্টে উপস্থিত হন তখন তাঁর সঙ্গে দশ হাজার আত্মনিবেদিত মুরীদান খলীফার পদতলে আত্মবিসর্জনকারী পতঙ্গের ন্যায় কোর্টে হাজির হন এবং খলীফা সাহেব বিচারকের কক্ষ হতে বের না হওয়া পর্যন্ত তারা বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন।

জনাব মৌলানা দিলওয়ার হুসেন সাহেব! একে বলা হয় ইলাহী জামা'ত, রূহানী জামা'ত এবং যিন্দা জামা'ত।

হযরত ঈসা (আ.) কত সুন্দর কথা বলেছেন, "বৃক্ষ তার ফল দ্বারা পরিচিত হয়"। মিথ্যা প্রলাপ ও বিদ্বেষ ইলাহী, রূহানী এবং যিন্দা জামা'তের গতিপথ পূর্বেও রোধ করতে পারেনি এবং এখনও করতে পারবে না। সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব জোর গলায় দাবী করেছিলেন যে, জামা'তে আহমদীয়াকে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্তি ঘটাবার জন্য এবং এর কেন্দ্র কাদিয়ানকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্য সঠিক সময়ে আল্লাহ্ তা'লা তাকে দাঁড় করিয়েছেন।

আজ কোথায় আছেন এই দাবীদার আর কোথায়ই বা আছে তার দলবল? তার মোকাবেলায় আজ জামা'তে আহমদীয়া ২০২টি দেশে বিস্তার লাভ করেছে এবং অনবরত বিস্তার লাভ করে যাচ্ছে। এর সহস্র সহস্র শাখা-প্রশাখা ধরা পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অবিরাম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর সংখ্যা দৈনন্দিন শত শত হতে সহস্র সহস্র এবং সহস্র সহস্র হতে লক্ষ লক্ষ এমন কি এখন কোটির সংখ্যা ছাড়িয়ে দুর্বার গতিতে বৃদ্ধি লাভ করছে।

এর গতিপথ রোধ করার জন্য যে সব মহা শক্তি দৃঢ় প্রত্যয়সহ দাঁড়িয়েছিল তারা একের পর এক ধরা পৃষ্ঠ হতে তারা বিলুপ্ত হয়েছে ***'ফা তা'বেরু উলিল আলবাব'*** হে বুদ্ধিমানগণ! এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আল্লাহ্ সকলের সহায় হোন। (পুণর্মূদ্রিত)

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেনঃ

"আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

রূপক-বর্ণনার অন্তরালে

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(৪র্থ কিস্তি)

(৩) দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত ব্যাখ্যা কি?

(ক) দাজ্জালের পরিচিতিঃ

আখেরী জামানায় হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে অন্যতম বিশেষ চিহ্ন এবং লক্ষণ হিসেবে 'দাজ্জাল' এবং 'দাজ্জালের বাহন' (খানে দাজ্জাল) সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীসের কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

* "যদি কেহ সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত পাঠ করে তাহলে সে দাজ্জালের ফেতনা হতে রক্ষা পাবে"। (মুসলিম, আবু দাউদ,নেসায়ী,কমজুল উম্মাল)।

* "যে কেহ দাজ্জালের দেখা পাবে সে যেন সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত এবং শেষ দশ আয়াত পড়ে।" (মসনদে আহমদ)

* "আদমের জন্ম হতে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে ভয়াবহ কোন ফেতনার সৃষ্টি হয় নাই" (মুসলিম মেশকাত)।

* "দাজ্জালের এক চোখ কানা হবে এবং তার কপালে 'কাফ-ফে-রে' লেখা থাকবে যা শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মোমেনই পড়তে পারবে।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, কনজুল উম্মাল)

* "বায়ু চালিত মেঘের ন্যায় দাজ্জাল দ্রুত গতিতে চলবে.....কৃত্তিম উপায়ে পশুগুলিকে মোটা-তাজা করবে এবং তারা বেশি পরিমাণে দুধ দিবে। তারা অনাবাদি অঞ্চলে ধন-রত্ন আবিস্কার করবে।"

* "আখেরী জামানায় দাজ্জাল প্রকাশিত হবে যারা ধর্মকে দুনিয়ার সাথে মিশ্রিত করবে।" (নেসায়ী, কনজুল উম্মাল)

* "দাজ্জালের আবির্ভাব কালে লোক নামায ত্যাগ করবে, আমানত খেয়ানত করবে, গর্বের সঙ্গে অত্যাচার করবে, শাসকগণ অত্যাচারী হবে, সুদের ব্যাপক প্রচলন হবে, খুন করা সাধারণ ব্যাপার হবে।" (কনজুল উম্মাল)

* "দাজ্জাল একটি যুবককে কেটে আবার জীবিত করবে"। (মুসলিম, তিরমিযি)

* "দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও দোযখ থাকবে। তার জান্নাত প্রকৃতপক্ষে দোযখ হবে।" (বুখারী, মুসলিম)

* "দাজ্জালের সঙ্গে রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকবে"। (মেশকাত)

* "দাজ্জাল মৃত জীব এবং মানুষের ছবি জীবন্ত আকারে দেখাবে।"(মুসলিম)

* "মক্কা ও মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্র দাজ্জাল পৌঁছে যাবে।" (মুসলিম)

(খ) দাজ্জালের গাধার পরিচয়ঃ

* "দাজ্জালের এক গাধা থাকবে।" (বায়হাকী)

* "দাজ্জালের গাধা আগুন ও পানি দ্বারা উটের ন্যায় চলবে, দিন ও রাত সব সময় চলবে এবং চিৎকার করে লোকজনকে ডাক দিবে।" (কনজুল উম্মাল)

* "দাজ্জালের মাথায় ধোঁয়ার পাহাড় হবে।" (কনজুল উম্মাল)

* "দাজ্জালের গাধার দুই কানের ব্যবধান হবে ৭০গজ।" (বায়হাকী)

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে বর্ণীত বিষয়গুলি যে একান্তই রূপক এবং ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয় তাতে কোন সন্দেহই নাই। ভবিষ্যদ্বাণী মুলক রুইয়া এবং কাশফের বর্ণনা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে: "আমি দেখিলাম যে সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করিতেছে।" (সূরা ইউসুফ: ৫) অনত্র রয়েছে:"স্বপ্নে তোমাকে যবেহ করিতে দেখিয়াছি" (সূরা সাফফাত:১০৩)। প্রথমোক্ত আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিজয় এবং দ্বিতীয় আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একটি মহা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। অনুরূপভাবে দাজ্জাল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য যুক্তিজ্ঞানের আলোকে এগুলি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, অন্যথায় আক্ষরিক অর্থে কখনোই দাজ্জালের গাধার জন্ম হবেনা এবং দাজ্জালও আসবে না।

সর্বপ্রথম যে বিষয়টির দ্বারা আমরা দাজ্জালের পরিচয় পেতে পারি তাহলো এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের পূর্বে দাজ্জালী ফেতনা এবং খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদী শিক্ষার প্রচার-এই দুইটি

বিষয়ের শক্তিশালী প্রভাব চরমভাবে পরিলক্ষিত হবে। এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের সূরা আল কাহফে বলা হয়েছে:"আল্লাহ্ এই কুরআন এইজন্য অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, ইহা ঐ সকল লোককে সতর্ক করিয়া দেয় যাহারা বলে যে, আল্লাহ্‌র একজন পুত্র সন্তান রহিয়াছে" (সূরা কাহফ: ৫)। সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াতে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্মের খন্ডন করা হয়েছে। তাই হাদীসে দাজ্জালী ফেতনা হতে বাঁচার জন্য সূরা কাহফের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি পড়তে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: 'দাজ্জাল' শব্দটির অর্থ হতেও বুঝা যায় যে, এর দ্বারা খৃষ্টান জাতিকেই বুঝায়। প্রসিদ্ধ আরবী অভিধান 'আকরাব এবং তাজ' অনুসারে দাজ্জালের অর্থ হলো 'একটি বৃহৎ দল বা জাতি যারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে নেয়, 'এরূপ কোন দল বা জাতি যারা ব্যবসা বানিজ্য ইত্যাদি দ্বারা জগতকে ছেয়ে ফেলে'। এই বর্ণনা এ যুগের ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদের জন্য যথাযথভাবে প্রযোজ্য-কারণ তারা প্রধানত: ব্যবসা বানিজ্য, সামরিক ও আর্থিক প্রভাব প্রতিপত্তি এবং সেই সঙ্গে মিশনারী পদ্ধতির দ্বারা সারা জগত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

তৃতীয়ত: এক চক্ষু-বিশিষ্ট হওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ হলো বৈষয়িক উন্নতি ও বস্তুবাদীতাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদির দিকে মনোযোগ না দেওয়া। বস্তুত: আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-শক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের চিকিৎসা করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে কপালে 'কাফ-ফে-রে' থাকার অর্থ হলো খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদীতা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জাতিসমূহের নাস্তিকতা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া যা বর্তমান জামানায় পূর্ণ হয়েছে। মৃতকে জীবিত করা, রুটির পাহাড় এবং জান্নাত সঙ্গে থাকা --- এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা যথাক্রমে চিকিৎসা শাস্ত্রে অপূর্ব অগ্রগতি, অর্থ সম্পদ ও খাদ্য উৎপাদনে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিলাস-বহুল জীবন-যাপনের আপাত:মধুর কৃষ্টি কালচারের লোভনীয়তাকে বুঝানো হয়েছে যা বর্তমান যুগে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান এবং নাস্তিকদের মাধ্যমে সর্বাধিক পূর্ণতা লাভ করেছে।

দাজ্জালের গাধা সংক্রান্ত হাদীসের বর্ণনা সমূহ শাব্দিক অর্থে কখনোই সম্ভব নয়। এগুলি ব্যাখ্যা করলে সহজেই বুঝা যায় যে, বর্তমান যুগের যানবাহন- যেমন, রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ, সামুদ্রিক জাহাজ ইত্যাদি আবিস্কৃত হয়েছে। এগুলোর দ্বারা বর্তমান যুগ যে দাজ্জালের আবির্ভাবের যুগ সুস্পষ্টভাবে তা প্রকাশিত হয়েছে। শাব্দিক অর্থে এরকম কোন গাধা কখনোই জন্ম হওয়া সম্ভব নয়।

(গ) ইয়াজুজ-মাজুজ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাঃ

পবিত্র কুরআনে সূরা আম্বিয়া এবং সূরা কাহফে ইয়াজুজ ও মাজুজের উল্লেখ রয়েছে। প্রথমোক্ত সূরায় নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে:-

"হাত্তা ইযা ফুতেহাত ইয়াজুজু ও মাজুজু ওয়াহুম মিন কুল্লে হাদাবি ইয়ানসেলুন।"

অর্থ: "তখনও এরূপ হইবে (পূর্ববর্তী আয়াত অনুযায়ী ধ্বংস ছড়াইয়া পড়িবে) যখন ইয়াজুজ ও মাজুজ ছাড়া পাইবে এবং তাহারা প্রত্যেক উচ্চস্থান হইতে দ্রুত ধাবিত হইবে।" (সূরা আম্বিয়াঃ ৯৭)

অন্য সূরায় রয়েছে:

"কালু ইয়া যালকারনাইনে ইন্না ইয়াজুজা ও মাজুজা মুফসেদুনা ফিল আরজে---- ফা এযা জায়া ওয়াদু রাব্বি জায়ালাহু দাক্কাও ওয়া কানা ওয়াদু রাব্বি হাক্কা"।

অর্থ: "তাহারা বলিল,"হে যুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিতেছে.... অত:পর যখন আমার রাব্বের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসিবে, তখন তিনি উহাকে (ইয়াজুজ-মাজুজকে প্রতিহতকারী প্রাচীরকে) খন্ড-বিখন্ড করিবেন এবং আমার রাব্বের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইবে"। (সূরা কাহফ: ৯৫-৯৯)

সূরা রহমানে দু'টি বৃহৎ দলের পরিস্থিতি এবং পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন: *"সানাফরুখ লাকুম আই ইউহাস সাকালাইন.... ইয়ারসালু আলায়-কুমা শুওয়াজুম মিন্নারে, ওয়া নুহাসুন ফালা তানতাছেরান।"*

অর্থ: "হে দুইটি বৃহৎ দল! আমরা শীঘ্রই তোমাদের দিকে মনোযোগ দিব..... তোমাদের উপর অগ্নি-শিখা এবং ধুম্ররাশি প্রেরিত হইবে, (তখন) তোমরা নিরুপায় হইয়া পড়িবে।" (সূরা রহমান:৩২-৩৬)

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে হাদীসে বেশকিছু বর্ণনা রয়েছে, যেগুলির মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

* "ইয়াজুজ ও মাজুজ যেখানে যাবে, সেখানে তারা রক্তপাত ও ধ্বংস সাধন করবে।" (মুসলিম ও তিরমিযি)

* "ইয়াজুজ ও মাজুজের সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যাবে।"(মুসলিম ও তিরমিযি)

* "ইয়াজুজ ও মাজুজ আকাশের দিকে তাদের তীরগুলি নিক্ষেপ করবে এবং সেগুলিকে আল্লাহ্ তা'লা রক্তরঞ্জিত করে ফিরিয়ে দিবেন..... 'মসীহ নবীউল্লাহ' তাঁর সাথীগণসহ দোয়া করবেন।" (মেশকাত)

* কেয়ামত উপস্থিত হওয়ার পূর্বে এই ঘটনাও প্রকাশিত হবে যে ফোরাত নদী হতে এক স্বর্ণ-পর্বত (কৃষ্ণ স্বর্ণ তথা পেট্রোলিয়াম) প্রকাশিত হবে এবং উহা পাওয়ার জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হবে।" (মুসলিম)

* "ইয়াজুজ ও মাজুজ মানুষদিগকে তাদের অধীনে নিয়ে আসবে এবং মুসলিম জাতি ভীত অবস্থায় শহরে ও দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে। ইয়াজুজ ও মাজুজ সমস্ত নহরের পানি পান করে ফেলবে।" (ইবনে মাজাহ, কনজুল উম্মাল)

ইয়াজুজ-মাজুজ সংক্রান্ত উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী-মূলক উদ্ধৃতিসমূহ পর্যালোচনা করলে তাদের পরিচিতি, আবির্ভাবকালের লক্ষণাবলী এবং পরিণাম সম্পর্কে জানা যায়। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীতে যে সকল প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার রয়েছে সেগুলোর প্রকৃত মর্মোদ্ধারের জন্য ব্যাখ্যা ও তাবির করা প্রয়োজন।

প্রথমত: পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত 'ইয়াজুজু ও মাজুজ' শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যেও তাদের পরিচিতির ইঙ্গিত রয়েছে। এই শব্দ দুটি 'আজ্জ ও আজিজ' শব্দমূল হতে উদ্ভুত, যার অর্থ হলো 'আগুন' 'পানি' অথবা 'দ্রুত গতিতে চলা' (আরবী অভিধান 'আকরাব' এবং লেন দ্রষ্টব্য)। বর্তমান যুগে পানি ও আগুনের মাধ্যমে শক্তির ব্যাপক ব্যবহার এবং বিভিন্ন দ্রুতগতি সম্পন্ন যন্ত্র এবং যানবাহনের আবিস্কার এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহারকারী পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের জন্য এই শব্দগুলি

বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে 'হাদাবুন' (যার অর্থ উচ্চ স্থান, তরঙ্গ-শীর্ষ) এবং 'ইয়ানসেলুন' (অর্থ-দ্রুত ধাবিত হওয়া) দ্বারা বৈজ্ঞানিক আবিস্কার, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে আধিপত্য, দ্রুতগতিতে পরিভ্রমণ ও ব্যবসা-বানিজ্যে শীর্ষস্থান এবং আনুসাঙ্গিক বিষয়ের প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের পরিচিতিই পরিস্ফুট হয়েছে।। তেমনিভাবে 'ফুতেহাত' (অর্থ: ছাড়া-প্রাপ্ত) শব্দের দ্বারা পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলির পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এবং অন্যান্য জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যা এই সকল জাতির মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত: প্রাচীন কালের পারস্য সম্রাট যুলকারনাইন ঐতিহাসিকভাবে সম্রাট সাইরাস যেভাবে তদানীন্তন ইয়াজুজ মাজুজের মোকাবেলা করেছিলেন, তেমনিভাবে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার যুগে ('ওয়াদু রাব্বি') সেই ইয়াজুজ-মাজুজের উত্তরসূরীগণ পুণরায় ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করলে পরবর্তীযুগের যুলকারনাইন হিসেবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আগমন করবেন এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় বান্দাদের নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন (সূরা কাহফের উপরোক্ত উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)। প্রাচীনকালের ইয়াজুজ ও মাজুজ নামক জাতি দ্বয় ক্যাস্পিয়ান সাগরের অদুরে ককেশাস পর্বতমালার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করতো। তারা এশিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্ব ইউরোপের অধিবাসী বলে ইতিহাস এবং বাইবেল হতে প্রমাণিত। (Historians History of the World, V-2 P-582, Jewish Encyclopaedia, Ezekiel 38; 2-6, 15; 39:6, আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত 'তফসীরে কবীর'-এর বরাতে দ্রষ্টব্য)।

উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকালে ইয়াজুজ-মাজুজেরই বংশধরগণ উত্তর-এশিয়া, ইউরোপ এবং ইউরোপ হতে কালক্রমে আমেরিকা ও অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি, ব্যবসা ও শিল্প, অর্থনীতি ও সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই সকল জাতি যেমন প্রভূত উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে, তেমনি এই সকল জাতি পরস্পর মারাত্মক যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। বিশ্ববাসীর জন্য পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে এর চেয়ে মারাত্মক ফেতনা এবং ভয়াবহ বিপদ আর কি হতে পারে? এই ফেতনা-ফ্যাসাদ ও মহাবিপদ মানবজাতির ভাগ্যাকাশে অনস্বীকার্য নির্মম এক সত্য এবং এর থেকে উদ্ধারের জন্য এ যুগের যুলকারনাইন অবশ্যই আগমন করেছেন। একদিকে এ যুগের প্রতিশ্রুত লক্ষণাবলীর প্রকাশ, অন্যদিকে অতীতকালের যুলকারনাইনের ন্যায় ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হিসেবে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) পারস্য বংশোদ্ভুত এবং দু'টি শতাব্দির মধ্যস্থলে আগমনকারী। শাব্দিক অর্থে 'যুলকারনাইন' অর্থ দুই শতাব্দীর মধ্যবর্তী এবং সেই হিসেবে হিজরী ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী, খৃষ্টীয় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী ও অন্যান্য বর্ষহিসাব অনুযায়ী দুই শতাব্দীর মধ্যস্থলে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে।

(ঘ) ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের মোকাবেলাঃ

এখন আমরা ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের মোকাবেলার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এর আগমন সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তন্মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করছি যাতে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে একদিকে যেমন দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, অন্যদিকে মহাকরুণাময় আল্লাহ্ তা'লার ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আবির্ভাবও যথাসময়ে ঘটেছে।

* "আল্লাহ্ তা'লা মসীহ মাওউদের নিকট ওহী নাযেল করে জানাবেন যে, একটি দল বাহির হয়েছে যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারও নাই, তুমি আমার বান্দাদের পর্বতে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ কর। মোটকথা, এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা ইয়াজুজ ও মাজুজকে বাহির করবেন, প্রত্যেক উচ্চতা হতে তাদের অবতীর্ণ হতে দেখা যাবে।" (মুসলিম)

* "মসীহ মাওউদ (আ.)-কে দেখে দাজ্জাল দ্রবীভূত হয়ে যাবে যেভাবে পানিতে লবণ দ্রবীভূত হয়"। (মুসলিম)

* "মসীহ মাওউদ (আ.) বিবাদকারীদের দোড়-গোড়া পর্যন্ত দাজ্জালকে অনুসরণ করবেন এবং সেখানে তাকে বধ করবেন।" (মুসলিম)

* "দাজ্জালের নানা প্রকার ভোজ-বাজি প্রদর্শন কালে আল্লাহ্ তা'লা মসীহ মাওউদ (আ.) কে আবির্ভূত করবেন।" (মুসলিম)

* "দাজ্জালের অনুসন্ধানে মসীহ মাওউদ (আ.) বাহির হবেন এবং লুদ নামক স্থানে গিয়ে মোকাবেলা করে তাকে হত্যা করবেন।" (মুসলিম)

* "দাজ্জালকে হত্যা করার দায়িত্ব প্রতিশ্রুত মসীহের উপর ন্যস্ত।" (মুসলিম)

* *"ইয়ানজিলা ফিকুম ইবনে মারাঈয়ামা হাকামান আদালান ফা-ইয়াকসেরুস সলীবা ওয়া ইয়াকতুলুল খিনজিরা ওয়া ইয়াজায়ুল জিযইয়া।"*

অর্থ: "ইবনে মরিয়ম নাযেল হইবেন যিনি তোমাদের মধ্যে মিমাংসাকারী ন্যায় বিচারক হইবেন এবং তিনি ক্রুশ ধ্বংস করিবেন, শুকর বধ করিবেন এবং 'যিজিয়া' রহিত করিবেন" (বুখারী)।

* "ইউশেকুমান আশা মিনকুম আহইয়ালকা ইসাবনা মারইয়ামা ইমামান মাহদীয়ান ওয়া হাকামান আদালান ফা-ইয়াকসুরুস সলীবা ওয়া ইয়াকতুলুল খিনজিরা ওয়া ইয়াজাউল হারব"।

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা দেখিতে পাইবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ইমাম মাহদী এবং মিমাংসাকারী ন্যায় বিচারক হিসাবে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করিবেন, শুকর নিধন করিবেন এবং ধর্ম যুদ্ধ রহিত করিবেন।" (মসনদে আহমদ বিন হাম্বল, জিলদ-২)

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির আলোকে ইহা সুস্পষ্ট যে, ইয়াজুজ মাজুজ ও দাজ্জালী ফেতনা হতে উদ্ধারের জন্য এবং বিশ্ববাসীকে ইসলামের আলোকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব অবধারিত ছিল। সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের আবির্ভাব সংঘটিত হয়ে যাওয়া কি একথা প্রমাণ করেনা যে, সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আগমন করেছেন?

বস্তুত:পক্ষে ইয়াজুজ-মাজুজ হলো বর্তমান কালের দুটি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি-জোট, যারা পরস্পর মারাত্মক প্রতিযোগিতা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছে। এই ফেতনারই আরেকটি দিক হলো ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস যা দাজ্জালী ফেতনা রূপে বিশ্বের চতুর্দিকে বর্তমান কালেই সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বস্তুত: সামরিক ও রাজনৈতিক বিপদাবলী (ইয়াজুজ-মাজুজের

ফেতনা) এবং ধর্মীয় ও নৈতিক সমস্যাবলী (দাজ্জালী ফেতনা) এই উভয় দিক হতেই আজ পৃথিবীতে মহা সংকটাপন্ন অবস্থা বিরাজমান। এই পরিস্থিতিতে ঐশী-প্রতিশ্রুত প্রতিকার ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের সুমহান শান্তি-বাণীকে পুণরায় বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এবং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয়-আকীদার অসারতা প্রতিপন্ন *(ইয়াকসিরুস সলীবা)* করার জন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যথাসময়ে আগমন করেছেন।

তিনি ইসলামের আলোকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং আহমদীয়া জামাত নামে ঐশী-প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন যা বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ পথে ইসলাম প্রচার কার্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এগিয়ে চলেছে। তিনি যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশী প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন যা বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ পথে ইসলাম প্রচার কার্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এগিয়ে চলেছে।

তিনি যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশী সাহায্য-পুষ্ট নিদর্শনাবলীর দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) একজন মানব রাসূলই ছিলেন, খোদা বা খোদার পুত্র ছিলেন না এবং তিনি অতীতের সকল নবী রাসূলের মতই ইন্তেকাল করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আকাশে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিশ্বাস একটি কাল্পনিক ও যুক্তিহীন ধারণা মাত্র। হযরত ঈসা (আ.)-এর সশরীরে আকাশে উত্তোলন এবং সেখানে সশরীরে জীবিত থাকা সম্পর্কিত বিশ্বাস বা আকিদার সমর্থনে যুক্তিপূর্ণ তথ্য বা নিদর্শন প্রকাশের জন্য তিনি বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন। তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে কোন মানুষের ক্ষমতা আছে কি?

এই সকল বিষয় .... এবং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলে একথা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, মানবজাতি এমন এক যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে যে বর্তমানে তাদের জন্য দুটি পথ খোলা রয়েছে: (১) এই মহা প্রতিশ্রুত যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ তথা ইসলামের পুণর্জাগরনের নেতৃত্বদানকারী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করে বিশ্ববাসী প্রতিশ্রুত শান্তি ও নিরাপত্তা, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার মহা প্রাচীরের আশ্রয়তলে ইহজীবনেই স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদ লাভ করতে সক্ষম হবে, অথবা

(২) ইয়াজুজ-মাজুজ এবং দাজ্জালের চক্করে পড়ে বিশ্ববাসী ক্রমবর্ধমান সংকটাপন্ন বিশ্ব-পরিস্থিতির নিষ্পেষণে দলিত-মথিত হয়ে ধ্বংস-স্তুপে পরিণত হতে থাকবে।

এই দু'টি পথের মধ্যে একটিকে অবশ্যই 'পসন্দ' (Choose) করতে হবে। একটি হলো প্রতিশ্রুত শান্তির পথ এবং অন্যটি ধ্বংসের পথ। যে কোন একটি পথ পসন্দ করার এই অধিকার জন্মগত, স্বাধীন এবং অলঙ্ঘনীয় অধিকার বলে স্বীকৃত (পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী: লা ইকরাহা ফিদ্দীন)।

সুতরাং সুধীসজ্জন এবং পবিত্র চিত্তদের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত হৃদয়ে এই সকল বিষয়ে সার্বিক দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীস সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন:

" মানুষের মাথায় যে কাল্পনিক দাজ্জাল রয়েছে তার কোন চিহ্ন বা লক্ষণ আমরা দেখতে পাই না। অপরদিকে আমরা দেখি, খ্রিষ্টানদের ফিতনা অনেক বেড়ে গেছে আর পৃথিবী তাদের ষড়যন্ত্রে ভরে গেছে। তাই বুঝা গেলো, খ্রিষ্টানদের প্রাধান্যের যুগে মসীহের অবতরনের অর্থ হলো, খ্রিষ্টান পাদ্রিরাই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল নতুবা এই স্ববিরোধী হাদীসগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। এ জাতীয় হাদীসের যে অর্থ বাস্তবে প্রকাশিত হয়েছে আমাদের পক্ষে সে অর্থই গ্রহণ করা আবশ্যক"। (হামামাতুল বুশরা)

তিনি বলেছেন," মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণীত হয়েছে, মসীহ ইয়াজুজ মাজুজের সাথে যুদ্ধ করবেন না আর বুখারী শরীফ অনুযায়ী, তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের সাথে বাহ্যিক যুদ্ধ করবেন না। তাই প্রমাণিত হলো, ইয়াজুজ মাজুজই খ্রিষ্টান জাতিভুক্ত।

আর এও প্রমাণিত হলো, মসীহ মাওউদ তাদের সাথে বাহ্যিক যুদ্ধ করবেন না বরং কঠিন সময়ে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য ভিক্ষা চাইবেন আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। এথেকে আরও প্রমাণিত হলো, মসীহ মাওউদ ধরাপৃষ্ঠে খ্রিষ্টানদের আধিপত্যের যুগে আসবেন। তিনি নমনীয়তার দ্বারপথে সংশোধনের উদ্দেশ্যে সেভাবে প্রবেশ করবেন যেভাবে তারা বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের জন্য প্রবেশ করেছে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে তরবারী হাতে নেবেন না কেননা তারা ধর্মের কারনে তরবারী হাতে নেয়নি।

তিনি তাদের সাথে প্রজ্ঞা ও উত্তম নসীহতের ভিত্তিতে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হবেন আর উদাসীন সীমালঙ্ঘনকারীদের বাহ্যিকভাবে হত্যা করবেন না। আর মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণীত হয়েছে, ইয়াজুজ মাজুজ তীর এবং তাদের ধনুককে ইন্ধনের মত জ্বালানো হবে আর মুসলমানরাই এগুলোকে পোড়াবে। মুসলমানগণ! এটি হলো হাদীসের একটি অন্যায় প্রক্ষেপণের উদাহরণ। কেননা তীর ধনুকের যুগের এখন অবসান ঘটেছে, আর আগ্নেয়াস্ত্র এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। চাইলে মানতে পারো নতুবা অস্বীকারও করতে পারো (হামামাতুল বুশরা)।

প্রকাশিত হয়েছে

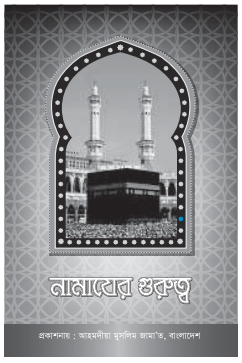

পাঠকের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে **হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)** প্রদত্ত নামায সংক্রান্ত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ খুতবা সম্বলিত আকর্ষণীয় বই-

'নামাযের গুরুত্ব' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বইটির মূল্য ৩০/- (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন এবং এর থেকে উপকৃত হোন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্ নবীঈন কেন?

খন্দকার আজমল হক

(৩য় ও শেষ কিস্তি)

তৎপূর্বে হাদীসে ব্যবহৃত ***'বাদ'*** শব্দের ওপর আলোচনা প্রয়োজন, কেননা এই ***'বাদ'*** শব্দের অর্থ নিয়ে যত গোল। পূর্বে ***'খাতাম'*** শব্দের অর্থের ওপর আলোচনাকালে আলোচিত হয়েছে যে, প্রত্যেক ভাষাতেই একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে। ***'খাতাম'*** শব্দের ন্যায় ***'বাদ'*** শব্দের অর্থ পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে যে, কুরআন পাকে ***'বাদ'*** নিম্নলিখিত চার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (১) বিরুদ্ধ ৯২) অব্যবহিত পর (৩) অনুপস্থিত ও (৪) পর।

উপরোক্ত অর্থে ব্যবহৃত ***'বাদ'*** শব্দ সম্বলিত আয়াত সমূহ পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে দেখা যাক।

(১) বিরুদ্ধ : তাঁর পাক কালামের এক স্থানে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, ***"ফাবি আইয়ে হাদীসিম বাদাল্লাহী ওয়া আয়াতিহি ইউমেনুন।"*** (৪৫:৭) অর্থ: "অতএব তারা আল্লাহ্ ও তাঁর নির্দেশাবলীর ***'বাদ'*** কোন কথার ওপর ঈমান আনবে?" এখানে 'বাদ' শব্দের অর্থ যে বিরুদ্ধে বা ব্যতীত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, "অতএব তারা আল্লাহ্ ও তার নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধে বা ব্যতীত কোন্ কথার ওপর ঈমান আনবে?"

(২) অব্যবহিত পর: অপর এক স্থানে আল্লাহ্ বলেন, ***"ওয়ালাকাদ আতায়না মুসাল কিতাবা ওয়া কাফফায়না মিম বাদিহির রাসূল।"*** (২:৮৮) অর্থ-"এবং আমরা নিশ্চয়ই মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তারপর পর্যায়ক্রমে তার অনুসরণে রসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম।" এখানে ***'বাদ'*** শব্দের অর্থ যে, পর পরই বা অব্যহিত পর তা' আয়াতটি মনোযোগের সাথে পাঠ করলেই অনুধাবন করা যায়। ইতিহাস হতেও জানা যায় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর অব্যবহিত পর হতেই পর্যায়ক্রমে এক নবীর মৃত্যুর পর অপর নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। এমনকি তাঁর জীবিতাবস্থায়ও তাঁর সাহায্যকারীরূপে হযরত হারূন (আ.)কে নবী করে পাঠানো হয়।

(৩) অনুপস্থিত : অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "এবং যখন আমরা মূসার সাথে চল্লিশ রাত্রির ওয়াদা করেছিলাম তখন তার ***'বাদ'*** তোমরা উপাসনার জন্য একটি গোবৎসকে গ্রহণ করেছিলে এবং তোমরা জালেম ছিলে।"

এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর জীবিতাবস্থায় ***'বাদ'*** ব্যবহৃত হওয়ায় সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, আয়াতটিতে 'বাদ' শব্দের অর্থ অনুপস্থিত ছাড়া আর কিছু নয়।

(৪) পর: এরূপ অর্থে 'বাদ' শব্দ কুরআনের অনেক স্থানেই ব্যবহার হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, ***"ফামানে' তাদা বা'দা যালেকা ফালাহু আযাবুন আলীম।"*** (৫:৯৫) অর্থ, "অত:পর যে ব্যক্তি এরপরও সীমালংঘন করবে সে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাবে।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহ হতে দেখা যায় যে, কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত ***'বাদ'*** শব্দের অর্থ সংশ্লিষ্ট আয়াতের সার্বিক অর্থের সাথে মিল রেখে করা হয়েছে। তদ্রুপ হাদীস শরীফে ব্যবহৃত 'বাদ' শব্দও সংশ্লিষ্ট হাদীসের সার্বিক অর্থের সাথে মিল রেখে করলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। 'বাদ' শব্দ সম্বলিত কয়েকটি হাদীস নিয়ে আলোচনা করলেই এর প্রমাণ মিলবে।

(১) নবী না আসার প্রধান যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে, "যেহেতু হুযূর পাক (সা.) বলেছেন, আমার পর নবী হলে উমর হতো', অথচ উমর নবী হননি, সেহেতু আর নবী হবে না।" কিন্তু একথা কারও অজানা নয় যে, জামানার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই সেই জামানার নবী হয়ে থাকেন এবং একথাও সবাই জানেন যে, হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর জামানায় উম্মতের ভিতর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। যে কারণে হুযূর পাক (সা.)-এর পরিবর্তে অন্য কারও নামাযে ইমামতি করার প্রয়োজন হলে হযরত উমর (রা.)-এর উপস্থিতিতে হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইমামতি করার নির্দেশ প্রদান করা হ'ত। সুতরাং হযরত আবু বকর (রা.) এর ন্যায় ব্যক্তি বর্তমান থাকতে হযরত উমর (রা.)কে কেন নবী হবার উপযুক্ত বলা হ'ল তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে।

হযরত উমর (রা.)-কে নবী হবার উপযুক্ত বলার মূল কারণ হল, আল্লাহ্ পাক তাঁর ভিতর শরীয়ত সম্পর্কিত কিছু জ্ঞান দান করেছিলেন। যেমন পর্দার নির্দেশ তাঁর প্রশ্ন তোলার জন্যই নাযেল হয়েলি, আযানের প্রচলনও তাঁর পরামর্শেই হয়েছিল। এজন্য হুযূর পাক (সা.) বলেছিলেন, আমার পরে কোন নবী হলে উমর নবী হত।" অর্থাৎ আমার পরিবর্তে অন্য শরীয়তধারী নবী

ওপরে বর্ণিত হুযূর পাক (সা.)-এর মর্যাদার এরূপ উচ্চতর প্রকাশ 'খাতামান্ নবীঈন' এর প্রচলিত অর্থ কেবলই 'শেষ নবী' দ্বারা হয় না। বলা হয়ে থাকে যে, রাসূল করীম (সা.) শেষ ও শ্রেষ্ঠ উভয়ই। একথা ঠিক যে, যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি অবশ্যই শেষ, কেননা তাঁর মত অতবড় মর্যাদাবান নবী আর কেউ হবেন না। এ অর্থে আমরাও তাঁকে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করি।

আসলে উমর আসত।" অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে "আমি না আসলে হে উমর! তুমি আসতে" (মেশকাত)। দ্বিতীয় হাদীসটি প্রথম হাদীসের অর্থ পরিষ্কার করে দিয়েছে।

(২) নবী না আসার দলিল হিসেবে নিম্নের হাদীসটিও পেশ করা হয়ে থাকে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, হুযূর পাক (সা.) বলেছেন, "বনী ইসরাঈলের নবীগণ শাসন করতেন, যখন কোন নবীর মৃত্যু হত, তখনই অন্য নবী তাঁর খলীফা হতেন। নিশ্চয়ই আমার বাদ নবী নেই, অচিরেই খলীফা হবেন এবং বহু খলীফা হবেন" (বুখারী)। হাদীসটি একটু মনোযোগের সাথে পাঠ করলে সহজেই বোঝা যাবে এখানে 'বাদ' শব্দটি দ্বিতীয়ার্থে অর্থাৎ অব্যবহিত পর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, "বনী ইসরাঈলের এক নবীর মৃত্যুর পর যেমন অন্য নবী তাঁর খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাদের শাসন করতেন, তেমনি হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পর কোন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন না কিন্তু খলীফা হবেন এবং বহু খলীফা হবেন।" এখানে "এবং বহু খলীফা হবেন" বলায় প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল পাক (সা.)-এর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের ধারায় পরিবর্তন আসবে। যেহেতু কুরআন পাকের ২৪:৫৬ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উম্মতে মুহাম্মদ খেলাফতশুণ্য হবে না, সেহেতু শুধু খেলাফতের ধারার পরিবর্তন আসবে। হযরত হোযায়ফা (রা.) বর্ণিত অন্য এক হাদীসে এর প্রমাণ মিলে। উক্ত হাদীস হতে জানা যায় যে খিলাফতের এই পরিবর্তন নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত পুন:প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হবে (মেশকাত)।

(৩) নবী না আসার দাবীর সপক্ষে নীচের হাদীসটিও পেশ করা হয়ে থাকে:

মুসআব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে হযরত রাসূল পাক (সা.) তবুক যুদ্ধে যাবার জন্য বের হলেন এবং হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত বা খলীফা নিযুক্ত করলেন। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, "আপনি কি আমাকে বালক ও স্ত্রীলোকদের ভিতর খলীফা করছেন?" হুযূর (সা.) বললেন, "তুমি আমার স্থলে হারূন (আ.) যেমন মূসার স্থলে ছিলেন, সেরূপ থাকতে সন্তুষ্ট নও? কিন্তু আমার বাদ কোন নবী নেই" (বুখারী)।

লক্ষ্য করুন, এখানে হুযূর (সা.) তাঁর জীবিতাবস্থায় 'বাদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতে অবস্থান কালে করেছিলেন। অতএব এ স্থলে 'বাদ' শব্দের অর্থ যে, অনুপস্থিতি হবে তা' সহজেই বোঝা যায়। নীচের হাদীসটি উপরে বর্ণিত হাদীসের অর্থ আরও পরিস্কার করে দিচ্ছে।

হযরত রাসূল পাক (সা.) তবুক যুদ্ধে যাবার সময় হযরত আলী (রা.)-কে বলেছিলেন, "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও? আমার স্থলে সেরূপ, যেরূপ হারূন (আ.)-এর স্থলে ছিলেন, প্রভেদ এই যে তুমি নবী নও" (তবকাতে কবীর)।

এভাবে 'লা নাবীয়া বাদী' সম্বলিত যত হাদীস আছে, তা' যদি পর্যালোচনা করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, কোন স্থানেই 'লা নাবীয়া বাদী' এর অর্থ 'আমার পরে আর কোন নবী নেই' বলা হয়নি।

হাদীসে বর্ণিত 'লা নাবীয়া বাদী' দ্বারা মানুষের বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকার কারণেই উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছিলেন, "তোমরা (হুযূর সা.কে) 'খাতামান্ নবীঈন' বল, 'লা নাবীয়াবাদী' বল না" (দূররে মনসুর)।

অতএব দেখা গেল কুরআন, হাদীস বা মুসলিম জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত কোন কিছু হতেই হযরত নবী করীম (সা.) শেষ নবী বা তাঁর পর আর কোন নবী নেই প্রমাণিত হয় না। পূর্বেই বলা হয়েছে, যে আয়াত খাতামান্ নবীঈন হুযূর (সা.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নাযিল হয়েছিল, তার সম্পর্কে এরূপ মর্যাদাপূর্ণ ভাষা কুরআন পাকের অনেক স্থানেই ব্যবহার হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তাঁকে আযীয বলেছেন, বলেছেন খুলুকিল আযীম, রাহমাতুল্লিল আল-আমীন, উসওয়াতুন হাসানা, সিরাজুম মুনিরা ইত্যাদি। এসবই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

সূরা নযমে তো হুযূর পাক (সা.)-কে মর্যাদার এমন উচ্চতম আসনে সমাসীন করা হয়েছে যে, সেখানে অন্য কোন নবীর পৌঁছানো সম্ভবই না।

বলা হয়েছে, ***"সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা, ফাকানা কাবা কাওসায়নে আও আদনা।"*** (৫৩:৯-১০) অর্থাৎ অত:পর

যেন দু' ধনুকের একতন্ত্রী হয়ে গেল অথবা উহা হতেও নিকটতর। এখানে কাবা কাওসায়নে দ্বারা আল্লাহ্ ও রাসূল করীম (সা.)-এর ভিতর এক প্রগাঢ় সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি মেরাজ বিষয়ক। মেরাজের সময় হযরত নবী করীম (সা.) ঊর্ধ্ব স্তর হতে ঊর্ধ্বতর স্তর অতিক্রম করতে করতে আল্লাহ্ তা'লার এমন নিকটে পৌঁছলেন যে, উভয়ের ভিতর আর কোন দূরত্ব রইল না। তাঁরা যেন দু'ধনুকের একতন্ত্রী হয়ে গেলেন। 'দু'ধনুকের এক তন্ত্রী' একটি আরবি বাগধারা, যদ্বারা দু'জনের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের প্রকাশ বুঝায়। এর দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা.) আল্লাহ্ তা'লার মাঝে নিজেকে এমনভাবে বিলীন করে দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাঁরই প্রতিচ্ছবি হয়ে গিয়েছিলেন। "উহা হতেও নিকটতর" শব্দগুলো দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা ও মহানবী (সা.)-এর মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা ও অন্তরঙ্গতা মানুষের চিন্তা ও কল্পনার অতীত। (দেখুন কুরআন মজীদ টিকা-২৮৭৬) কুরআনের নির্দেশ ***'সিবগাতাল্লাহ্'*** অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গীন হও' যে তাঁর ভিতর পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল, সূরা নযমের উপরোক্ত আয়াত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ওপরে বর্ণিত হুযূর পাক (সা.)-এর মর্যাদার এরূপ উচ্চতর প্রকাশ 'খাতামান্ নবীঈন' এর প্রচলিত অর্থ কেবলই 'শেষ নবী' দ্বারা হয় না। বলা হয়ে থাকে যে, রাসূল করীম (সা.) শেষ ও শ্রেষ্ঠ উভয়ই। একথা ঠিক যে, যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি অবশ্যই শেষ, কেননা তাঁর মত অতবড় মর্যাদাবান নবী আর কেউ হবেন না। এ অর্থে আমরাও তাঁকে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু তাঁর দ্বারা নবুওয়াতের সমাপ্তি সাধিত হয়েছে, তারপর আর কোন নবী আসবে না এই অর্থে শেষ হলে তিনি শ্রেষ্ঠ হন কীভাবে? শেষ কোন মর্যাদাবোধক শব্দ তো নয়ই বরং ইহা কোন কিছুর সমাপ্তি ঘোষণা করে তার অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে বিধায় তা' মর্যাদাহানিকর নয় কি?

যেমন কোন বংশ, গোত্র বা জাতির সমাপ্তি তখনই হয়, যখন তার প্রধান অকর্মণ্য বা অযোগ্য হয়, অথবা তার কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ করার কারণে অভিশপ্ত হয়ে পরে। যেরূপ এক সময় মোগল সাম্রাজ্য ভারতের ঐতিহ্যবাহী সাম্রাজ্য ছিল। যার শেষ সম্রাট ছিলেন সম্রাট বাহাদুর শাহ্। কে না জানে যে, তার অযোগ্যতা ও দুর্বলতার কারণেই ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। অনুরূপ কঠিন অপরাধের কারণে তৎকালীন উন্নত বলে পরিচিত আদ এবং সামুদ জাতি শেষ হয়ে এখন ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করেছে। নবীদের সাথে দুর্ব্যবহারের কারণে বনী ইস্রাঈলগণ নবুওয়াত রূপ নেয়ামত হতে বঞ্চিত হয়েছে। যা ইবরাহিমী গোত্রের অন্য ধারায় স্থানন্তরিত হয়। (বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৮)

কিন্তু হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা নিয়ে কোন প্রশ্ন তাঁর চরম বিরুদ্ধবাদীগণও করতে পারেনি। তাঁর জাতিও এমন কোন অপরাধ করেনি যে, তারা নবুওয়াতরূপ নেয়ামত হতে বঞ্চিত হবে, যার ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়েছে।

হ্যাঁ, নবুওয়াতের যদি প্রয়োজন না থাকত অর্থাৎ যদি মুসলমানদের অধ:পতন না ঘটত, তাদের ভিতর যদি অধার্মিকতা বৃদ্ধি না পেত, তবে তাদের ভিতর নবী না আসার যৌক্তিকতা মেনে নেয়া যেত। কিন্তু পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এমন এক সময় আসবে যখন ইসলাম শুধু নামেই বিদ্যমান থাকবে, কুরআনের শিক্ষা মুসলমানদের ভিতর হতে উঠে যাবে, আলেম বলে পরিচিত মুসলিম ধর্মীয় নেতাগণ নিজেরাই হেদায়তশুন্য হবে। এরূপ অবস্থায় নবী ব্যতীত আর কে তাদের হেদায়াত প্রদান করবে?

বলা হয়ে থাকে, যেহেতু কুরআন শেষ শরীয়ত, সুতরাং নবীর আর প্রয়োজন নেই। জানা প্রয়োজন, শরীয়ত শেষ হলেই নবুওয়াত শেষ হয় না। কেননা শরীয়তের অধীনেও নবী আসতে পারে (৫:৪৫)। অতএব শরীয়ত শিক্ষা দিবার জন্য নবীর প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, আল্লাহ্ তাঁর পাক কালামে নবুওয়াত ও বাদশাহাতকে তার দেওয়া নিয়ামত বলে উল্লেখ করেছেন (৫:৪০)। এটা অনস্বীকার্য যে, জাগতিক দিক দিয়ে যেমন বাদশাহাত, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে তদ্রুপ নবুওয়াত আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবার আল্লাহ্ তাঁর পাক কালামে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে উল্লেখ করেছেন (৩:১১১)। শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়ে যদি শ্রেষ্ঠ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকে তবে শ্রেষ্ঠ উম্মতের বৈশিষ্ট থাকল কোথায়? অথচ অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদা সম্পন্ন উম্মত হয়েও বনী ইস্রাঈলগণ বাদশাহাত ও নবুওয়াত উভয় নিয়ামতেরই অধিকারী ছিল! (৫:৪০)। বরং আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুসলমানগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল নিয়ামতের অধিকারী হবে (৫:৪)। যেখানে এক স্থানে আল্লাহ্ উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে সকল নিয়ামতের অধিকারী বলে উল্লেখ করেছেন, সেখানে অন্য স্থানে তাদের নবুওয়াতরূপ শ্রেষ্ঠ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রেখে হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর শরীয়তের আনুগত্যকারী নবী নাই বলা আল্লাহ্‌র নিয়ম বিরুদ্ধ নয় কি? অথচ আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন যে, তাঁর কথার ভিতর কোন গরমিল নেই (৪:৮৩)।

অতএব যুক্তিতেও প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর "কোন প্রকার নবী নেই"। কথাটা সঠিক নয়।

আশা করি, যারা খাতামান্ নবীঈন এর অর্থ কেবলই "শেষ নবী" করেন, এখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারছেন এবং হযরত রাসূল করীম (সা)-কে কেন "খাতামান্ নবীঈন" বলা হয়েছে তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। এও আশা করছি যে, তারা হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী "সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী"-রূপে নবীর আগমন স্বীকার করে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ওপর ঈমান এনে ইসলামী খিলাফতের ঝান্ডাতলে সমবেত হয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে এগিয়ে আসবেন। কেননা ইসলাম প্রচারে অংশ গ্রহণ করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এর জন্যই রাসূল পাক (সা.) সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন, অর্থাৎ এটাই ছিল তাঁর প্রকৃত সুন্নত। যারা নিজেদের সুন্নাতুল নাযাতের সদস্য বলে প্রচার করেন, তারা হুযূর পাক (সা.)-এর আমলী সুন্নত হতে দূরে থাকার কারণেই ইসলামের প্রসার বন্ধ হয়ে গেছে। আজ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জামা'তই জান ও মাল দিয়ে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত আছে যার নির্দেশ আল্লাহ্ পাক সূরা সফের ১১-১২ আয়াতে দিয়েছেন এবং রাসূল পাক (সা.) বিদায় হজ্জের দিনে যার দায়িত্ব সকল মুসলমানদের ওপর অর্পন করেছিলেন, যা রাসূলুল্লাহ্‌র প্রকৃত সুন্নত। আল্লাহ্ সকলকে সত্য বুঝবার তৌফিক দিন, আমীন।

ঈদ মুসলিম উম্মাহকে আনুগত্যের শিক্ষা দেয়

মাহমুদ আহমদ সুমন

সারা মুসলিম জাহানে সিয়াম-সাধনা এবং ত্যাগের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বান্দা তার অতীতের সকল ভুল-ভ্রান্তির ক্ষমা চেয়ে পরবর্তী জীবনে এ প্রশিক্ষণলব্ধ আমলে সালেহ যথাযথ কাজে লাগিয়ে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলার অঙ্গীকারে প্রত্যয়ী হওয়ার এক সফল অনুষ্ঠান এ পবিত্র ঈদ।

ঈদ সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) ঈদুল ফিতরের এক খুতবায় বলেন, আমাদের প্রকৃত ঈদ তখনই হাসিল হবে যখন পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম বিস্তার লাভ করবে, যখন মসজিদ আল্লাহ্‌র স্মরণকারীতে ভরে যাবে এবং যখন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এবং কুরআন করীমের সত্যিকার শাসন দুনিয়ার কোণে কোণে পৌঁছে যাবে।

....আমাদের সবচেয়ে বৃহৎ ঈদ তখনই হবে যখন ইসলাম পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে এবং দুনিয়ার প্রত্যেক কোণ থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উঠতে শুরু করবে। (ঈদুল ফিতরের খুতবা, ৭ জুলাই, ১৯৪৮)

যে আনন্দ বিশ্ববাসীর মাঝে বার বার ফিরে আসে তাকেই ঈদ বলা হয়। ইসলাম ধর্ম বিকশিত হবার বহুপূর্ব থেকে মর্ত্যবাসীদের বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠি ও ধর্মের অনুসারিরা নানা ভাব ও ভঙ্গিতে ঈদ পালন করতো। তবে ইসলাম ধর্মেই কেবল মাত্র ঈদকে সার্বজনীন ইবাদত রূপে রূপায়ন করা হয়েছে।

আর কয় দিন পরেই আমরা এক মাস সিয়াম সাধনা শেষ করে ঈদ পালন করতে যাচ্ছি। ঈদ আমাদেরকে এ নিয়্যতে উদযাপন করা উচিত- যাতে আমাদের সৃষ্টিকারী খোদার সন্তুষ্টির প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে, খোদার ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি থাকে।

আমরা যদি সর্বদা এই চিন্তা করি যে, নেকী ও তাকওয়াকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলন করাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই খোদা তাআলার নির্দেশমত চলতে হবে। আর এ শিক্ষাই কিন্তু আমরা রমযানের রোযা আর ঈদ থেকে লাভ করি।

এক মাসের রোযা এবং ঈদ দু'টিই আমাদেরকে আনুগত্যের শিক্ষা দেয়।

আমরা এক মাস রোযা রাখি তারপর ঈদ উদযাপন করি, এসব কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের খাতিরেই করে থাকি। খোদা তা'লার কৃপা হলে ক'দিন পর আমরা সবাই ঈদ উদযাপন করার সৌভাগ্য লাভ করবো। এই যে ঈদ উদযাপন করবো এটাও কিন্তু আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ফলশ্রুতিতেই আমরা করবো।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রা.) বলেন, ঈদ এমন এক বিষয় যে, পৃথিবীর সকল জাতি এটিকে পালন করে থাকে। কেউ এর নাম তাহ্‌ওয়ার রাখে, কেউ ঈদ এবং কেউ খৃষ্টমাসটডে বলে অভিহিত করে মোটকথা, দুনিয়ার এমন কোন জাতি নেই যাদের মধ্যে আনন্দ উৎসব নাই। প্রত্যেক জাতি কোন কোন ভাবে ঈদ পালন করে। এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, আনন্দ উৎসবের আবেগ মানব প্রকৃতিগত। এই আবেগ যদি প্রকৃতিগত না হতো তাহলে প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক জাতির মধ্যে কেন আনন্দ উৎসব করা হয়? শত শত এবং হাজার হাজার বছর পর্যন্ত মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে।

আমেরিকাবাসীগণ পৃথিবী অন্য জাতির সাথে ততদিন পর্যন্ত মিলতে পারে নাই,

ঈদুল ফিতর রমযানের পূর্বে বা মাঝে অথবা দু'চার দিন পরে আসে না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই ঈদ রোযা পুরা করার আনন্দস্বরূপ এসেছে। সেজন্যই রমযানের পূর্বে ঈদ রাখা হয়নি, মধ্যভাগেও না কিংবা বিরতির পরও নয়। রমযানের অব্যবহিত পরেই এর আগমন প্রমাণ করে যে, ইবাদতের পূর্ণতার আনন্দস্বরূপ এই ঈদ নির্ধারণ করা হয়েছে।

যতদিন পর্যন্ত না কলম্বাস এটিকে আবিস্কার করে। অষ্ট্রেলিয়াবাসীরাও এক সময় পর্যন্ত অন্য জাতির সাথে মিলতে পারে নাই। কিন্তু তবু সেদেশের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, তাদের পুরাতন বাসিন্দাদের মধ্যে আনন্দ উৎসবের প্রথা ছিল। অনুরূপভাবে আফ্রিকার পুরনো বাসিন্দাদের মধ্যেও তেহওয়ার পাওয়া যায়। যাহোক ঈদের উপলক্ষ্য বিভিন্ন হলেও এর অস্তিত্ব প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক দেশে পাওয়া যায়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকৃতির সাথে ঈদের সম্বন্ধ রয়েছে।

ইসলামেও বছরে দু'টি ঈদ রাখা হয়েছে। যেমন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এছাড়া রাসূল করীম (সা.) জুমুআর দিনকেও মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন বলে ধার্য করেছেন। ফলে ইসলাম ঈদের দিক দিয়ে অন্যান্য জাতি ও ধর্মের তুলনায় অগ্রগামী। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ঈদ কাকে বলে? নিশ্চয় কোন কারণ আছে যেজন্য প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে ঈদের ব্যবস্থা আছে।

ঈদের ব্যবস্থার কারণ এটাই যে, মানুষ যদি সদা দুঃখকে দেখতে থাকে, তাহলে তাদের শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। কখনও কখনও তাদের দৃষ্টি উচ্চ লক্ষ এবং সফলতার দিকেও আকৃষ্ট হওয়া উচিত। যদি তারা জতীয় সাফল্যের স্মৃতিকে জাগরুক রাখে এবং নিজেদের লক্ষকে স্থির রাখে তাহলে তাদের উদ্দীপনা বাড়তে থাকবে এবং এর দ্বারা জাতি মরবে না। যদি আনন্দ উৎসব পালিত না হয় অথবা আনন্দ উৎসব পালিত হয় কিন্তু এর কোন উপলক্ষ না থাকে বরং এক গতানুগতিক প্রথা মাত্র হয় তাহলে জাতি মরে যায়। ঐ জাতির আত্মা মরে যায় এবং কেবল ছবি বাকী থেকে যায়।

...যদি সত্যিকার ভাবে জান ও মালি কুরবানীর প্রেরণা পাওয়া যায়, যদি আমরা কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চাই তাহলে আমাদের ঈদ সত্যিকার ঈদ এবং আমরা আল্লাহ্ তা'লা ও রাসূল করীম (সা.) এর সম্মুখে চোখ তুলে চাইবার যোগ্য। নচেৎ আমাদের ঈদ কিছুই নয়, বরং প্রত্যেক ঈদ আমাদেরকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রাণহীন করে দিবে।

(১৯৪১ সনের ২৮ জুলাই প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবা)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আরেক ঈদের খুতবায় বলেন, ঈদুল ফিতর রমযানের পূর্বে বা মাঝে অথবা দু'চার দিন পরে আসে না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই ঈদ রোযা পুরা করার আনন্দস্বরূপ এসেছে। সেজন্যই রমযানের পূর্বে ঈদ রাখা হয়নি, মধ্যভাগেও না কিংবা বিরতির পরও নয়। রমযানের অব্যবহিত পরেই এর আগমন প্রমাণ করে যে, ইবাদতের পূর্ণতার আনন্দস্বরূপ এই ঈদ নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু কতিপয় লোক একটু আধটু ত্রুটিপূর্ণ কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকার করেই ঈদ উদযাপন করে নেয়। নিষ্ফল ও ব্যর্থ কুরবানীও করা হয়। কোন কোন কুরবানী বৃথা ও অযথা এবং একটু আধটু হয়ে থাকে। যাদের কুরবানী অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে,তাদের ঈদও অসম্পূর্ণ ঈদ হয়। যাদের কুরবানী বৃথা ও অযথা হয়ে থাকে, তাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন ঈদই নেই। কেননা ঈদুল ফিতর কুরবানীর পরিপূর্ণতার চিহ্নস্বরূপ রাখা হয়েছে। কাজেই ত্যাগের পূর্ণতার কারণে ত্যাগ স্বীকারকারীর উচিত আনন্দ উপভোগ করা।

বস্তুত: ঈদুল আযহিয়া মুসলামনদের জন্য একপ্রকার জন্মলাভের ঈদস্বরূপ, যখন আমরা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর অনুসরণে ছাগ বা অন্যান্য পশু কুরবানী দেই, এই কুরবানী একথার আলামতস্বরূপ হয়ে থাকে যে, কুরবানীর এই ছাগ বা পশুগুলির ন্যায় প্রয়োজন হলে আমরা আমাদের কামনা-বাসনা ও প্রাণ আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবান করে দিব এবং যে কোন প্রকারের কুরবানীই হোক তা থেকে আমরা কুণ্ঠিত হবো না।

আমাদের এই অঙ্গীকার গ্রহণের পর আনন্দ উৎসব উদযাপন করা এমনই হয়ে থাকে যেমন শিশুর জন্মের পর মা-বাবা আনন্দ উদযাপন করেন এবং ঐ শিশুর সাথে অনেক বড় আশা-আকাঙ্খা বিজড়িত করেন। তারা আশা রাখেন যে, এই সন্তান তাদের জন্য বরকতের কারণ হবে, অথচ কোন কোন সন্তান বড় হয়ে বাবা-মা'র ভীষণ অবাধ্য হয় এবং তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টের কারণ হয়। কিন্তু তাদের জন্মের সময় তাদের পিতা-মাতা মনে নেক আশাই পোষণ করে থাকেন। ঈদুল আযহিয়া আমাদের রূহানী জন্মের দিনস্বরূপ হয়ে থাকে। সেদিন আমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায়

কুরবানী পেশ করার অঙ্গীকার করি।

ঈদুল ফিতর পালন করে আমরা একথা ঘোষণা করি যে, আমরা যে অঙ্গীকার করেছিলাম তা পূরণ করে গিয়েছি। আর জুমুআর দ্বারা একথার ঘোষণা করি যে, আমরা এক হাতের উপর একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ আছি। ঈদ উদযাপনের কেবল তিনটিই উপলক্ষ্য। প্রথমত গোটা জাতি যেন কুরবানী ও ত্যাগ তিতিক্ষার অঙ্গীকার করে।

দ্বিতীয়ত জাতি ঐ অঙ্গীকার বাস্তবায়ন সুসম্পন্ন করে। তৃতীয়ত সমগ্র জাতি নিজেদের মধ্যে ঐক্যের প্রেরণা সৃষ্টি করে এবং এহ হাতের উপর একত্রিত হয়। এই সেই তিন উপলক্ষ্য যা ঈদ বলে অভিহিত হবার যথার্থ অধিকার রাখে। উক্ত তিন ঈদে মুসলমানদের এ সবক দান করা হয়েছে যে, মুসলমানদের উচিত সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করা। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। উক্ত তিন ইবাদতই ইসলাম সম্মিলিত ও সমবেতভাবে পালনের আদেশ দিয়েছে এবং এ উপলক্ষ্যগুলিতে মুসলমানদেরকে এই উপদেশ দিয়েছে যে, অন্যান্য জাতির ন্যায় তোমরাও নিজেদের ধর্মকে ব্যক্তিগত রূপ দিওনা। (ঈদুর ফিতরের খুতবা, ২৯ আগষ্ট ১৯৪৬)

ঈদ শুধু আনন্দ উৎসবের নাম নয় বরং মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মুসলিম মিল্লাতের জন্য একটি বিশেষ রহমত ও আল্লাহ্‌র দেয়া আদেশ। যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। অন্য কথায় ঈদ হলো তাকওয়া ও ত্যাগের মহিমার সাফল্যের বিজয়ের প্রতীক ও আনন্দের দ্যোতক। বলা যায় আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর অপছন্দনীয় সকল কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সারা মাস রোযা থাকার ফলে হৃদয় থেকে যে আনন্দ বের হয়ে আসে তা-ই প্রকৃত ঈদ। যারা পবিত্র মাহে রমযানের সারা মাস রোযা রেখেছে এবং অন্যান্য ইবাদত গভীর মনোনিবেশ সহকারে করেছে তাদের জন্যই ঈদ প্রকৃত আনন্দের আর এই ঈদ ইবাদতের।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ১৩ অক্টোবর ২০০৭ মসজিদে বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে ঈদুল ফিতরের খুতবা প্রদানকালে এক স্থানে বলেন- "আল্লাহ্ তা'লার আদেশে এক মাস রোযা রাখার পর তাঁর আদেশেই আজ আমরা আনন্দ প্রকাশ করছি। এক মাস রোযা আমরা আমাদের তাক্ওয়াকে ও ঈমানকে বাড়ানোর জন্য রেখেছি।

আমরা রমযানের রোযা এজন্য রেখেছি–যেন তাঁর নৈকট্য অর্জনকারী হতে পারি। তাক্ওয়া বাড়ানোকারী হতে পারি। এ মাস পূর্ণ হওয়ার পর, এ কুরবানী ও রোযা পূর্ণ করার পর আল্লাহ্ তা'লা আজ আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আনন্দ উৎসব কর। প্রত্যেক বৈধ কাজ যা থেকে তোমাদেরকে এক নির্ধারিত সময় বিরত রাখা হয়েছিল তা কর। খাও, আনন্দ কর, নতুন কাপড় পড়, সুগন্ধি লাগাও। কিন্তু আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল হওয়ার অবকাশ নেই।

কৃতজ্ঞতার সর্বোত্তম পন্থা হলো –মসজিদে একত্রিত হয়ে ঈদের নামায পড়। এতে রমযানের রোযার ও কুরবানীর (ত্যাগের) আকারে যে নেকী করেছ বা করার তৌফিক পেয়েছ, এর কৃতজ্ঞতা আদায় কর। সুতরাং এ ঈদ ভাল খাওয়ার ও পরার এবং বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় আনন্দ ভ্রমণ করার নাম নয়। বরং কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ঈদ দান করেছেন। তাই এতে শুকরিয়া আদায় কর।

এ ঈদ হাসি খুশি, রং তামাশা, খাওয়া দাওয়া ও বন্ধুদের সাথে মজা করার নাম নয়। বরং আল্লাহ্ তাআলার আদেশে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্তে পরিপূর্ণ আনুগত্যে সমস্ত বৈধ বিষয় থেকে এক মাস বিরত থাকার পর আল্লাহ্‌র আদেশে আবার সেগুলো চালু করার নাম।

আমাদের ঈদগুলো যেন আমাদেরকে ঐ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়- যে ইবাদতের ও ত্যাগের স্বাদ আমরা লাভ করেছি আর যার ফলশ্রুতিতে আজ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিবি বাচ্চা ও জামা'তের সদস্যদের সাথে মিলে আনন্দ করার সুযোগ দিচ্ছেন, এই ত্যাগ ও ইবাদতকে যেন আমরা চিরস্থায়ী করে নেই। যেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের প্রতিটি দিন রোযার ঈদ হয়ে উদিত হয়।

আমরা যখন পুরোপুরি স্থায়ীভাবে আমাদের গরীব ভাইদের অভাব দূরীকরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো তখনই এটা আমাদের প্রকৃত ঈদ উদযাপন হবে। সুতরাং আমাদের এতে খুশী হওয়া উচিত নয়, আমরা গরীবদের সাময়িক খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বরং স্থায়ী খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দেয়ার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। নিজের বাচ্চাদেরকে ঈদের এ মাহেন্দ্রক্ষণে গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া উচিত। তাদেরকে ঈদের যে উপহার দেয়া হয়, তা থেকে যেন তারা একটা অংশ গরীবদের জন্য পৃথক করে নেয়। তারা যেন শুধু নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিই খেয়াল না রাখে, নিজেরাই যেন চকলেট ইত্যাদি না খায়। সাথে সাথে গরীব বাচ্চা যারা ক্ষুধার্ত ও পিপাষার্ত রয়েছে তাদের প্রতিও যেন তারা খেয়াল রাখে।"

মুসলমানের জন্য ঈদ একটি মহা ইবাদত। ঈদের ইবাদতে শরীয়ত নির্দেশিত কিছু বিধি-বিধান রয়েছে, যা পালনে সামাজিক জীবনে পারস্পরিক আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও বন্ধন সুসংহত হয়। ঈদুল ফিতরের শরীয়ত দিক হলো, ঈদের নামাযের পূর্বে রোযার ফিতরানা ও ফিদিয়া আদায় করা, ঈদ গাহে দু' রাকাত নামায আদায় করা, খুতবা শুনা এবং উচ্চস্বরে তাকবির পাঠ করা।

ঈদের মাধমে আমাদের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি ঘটে আর পরস্পরের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং নিজেদের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যদি এমনটা হয় তাহলেই আমাদের এ ঈদ পালন ইবাদতে গন্য হবে। যারা খেলা ধূলা ও আনন্দ উৎসবে মেতে দিন অতিবাহিত করে তাদের জন্য এ ঈদ জীবনে কোন পরিবর্তন বয়ে আনবে না। তাদের জন্য ঈদ একটি আনন্দ মেলা বৈ কিছু নয়।

তাই আমাদের এ ঈদ উদযাপন যেন কল্যাণময় ও ইবাদতে পরিণত হয় এ দোয়াই আমাদের করা উচিৎ। আর কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ঈদ দান করেছেন। আমাদের এতে বেশি বেশি খোদার শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

masumon83@yahoo.com

ইসলাম ও মালী কুরবানী

মৌলবী মোজাফফর আহমদ রাজু

(২য় কিস্তি)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেছেন, "যারা ধন-সম্পদ খরচ না করে জমা করে রাখে, তাদের ধ্বংসের দোয়া (হাদীস বর্ণিত) সম্পর্কে বলছি। অনেক সময় দেখা যায় যে, যারা কৃপণ, খরচ করে না, তাদের ধ্বংস হয় না কেন ধ্বংস করা হয় না? এই বিষয়ে পূর্বেও বলেছি– আল্লাহ্ তা'লা মু'মিন বান্দাদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করেন, তাদের কোন ভুল-কর্মে নিজ কৃপায় তাদের রক্ষা করবেন। অথচ সে যদি আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচের ব্যাপারে কৃপণতা করে, এমন ব্যক্তিদের সম্পদ ধ্বংস হতে আরম্ভ করে। যেন সে হোঁচট খেয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে। অনেক সময় এমন ব্যক্তিরা শিক্ষা লাভ করে থাকেন, তারা আমাকে লিখেছেন যে, এখন তারা বুঝতে পেরেছেন, পূর্বে ভুল করেছিলেন। এখন যখন আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা আরম্ভ করেছেন–আল্লাহ্‌র রহমতে আর্থিক উন্নতি হতে আরম্ভ করেছে। অপরপক্ষে আল্লাহ্ যাদেরকে নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে করে নিয়েছেন, তাদেরকে শুকনো কাষ্ঠ মনে করেছেন, তাদেরকে পৃথক করে রেখেছেন। তাদের সম্পদ অনেক সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে দেখা যায়, শ্রীঘ্রই ধ্বংস হতে দেখা যায় না। কিন্তু জামা'তে আহমদীয়া এই সমস্ত লোকদের ভ্রুক্ষেপ করে না। তারা তাদের সম্পদ নিয়ে যা খুশি করেন, যেখানে খুশি যান, জামা'তের তাতে সামান্য পরিমানও অভাব হয় না। তাদের স্থলে আল্লাহ্ তা'লা আরো এমন ব্যক্তি সৃষ্টি করেন, যারা কুরবানীর ময়দানে নেমে আসেন। আমাদের সাথে আল্লাহ্‌র এই সদ্ব্যবহার আদিকাল থেকে হয়ে আসছে' (জুমআর খুতবা, ২রা জানুয়ারী ১৯৯৮ইং)। ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্‌র ধর্মের সেবা করা ও মানবতার সেবা করা, এমন কি আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টির সেবা করা, এ এক মহান কাজ, এ এক মহান হেকমত। আল্লাহ্ তা'লার বাণী, "তিনি যাকে চান হেকমত প্রদান করেন এবং যাকে হেকমত প্রদান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ-প্রদান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান লোক ব্যতিত কেহ উপদেশ গ্রহণ করে না' (সূরা বাকারা : ২৭০)।

এই আয়াতে ধর্মের খাতিরে ধন-সম্পদ কুরবানীকারীদের জন্য কত শক্তিশালীভাবে সূক্ষ্ম ও চিরস্থায়ী এক পথের সন্ধান দিতে চাচ্ছে। হে দুনিয়াবাসী! যে ধন তোমার নিকট আছে, এ ধন কার? তুমিতো আমার আমার করে আওয়াজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছ, কিন্তু তুমি কি জান যে, তোমার কোন ধন-সম্পদ নাই, যদি না সেই মালিকের ধর্মের সেবার জন্য তোমার ধন হতে কুরবানী না করে থাক। তুমি সেই আকাশের খোদার জন্য যতটুকু ধন খরচ করেছ, ততটুকু তুমি তোমার বলে দাবী করতে পার। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতের মধ্যে ব্যক্ত করেছেন যে, তোমরা যারা আমার রাস্তায় ধন কুরবানী কর, তারা আমার পক্ষ থেকে হেকমত শিক্ষালাভ করেছ আর আমি তোমাদেরকে বুদ্ধিমান করেছি। পরিস্কার কথা, যারা আল্লাহ্‌র ধর্মের প্রয়োজনে নিজ ধন হতে অংশবিশেষ কুরবানী করে, তারাই হেকমত ওয়ালা ও বুদ্ধিমান লোকদের মধ্যে, তারাই প্রজ্ঞাবান, তারাই আল্লাহ্‌র হেকমত সম্পর্কে জ্ঞাত। এই দুই প্রকার লোকেরাই সমাজে, জাতিতে ও দেশে সম্মানিত এবং অনেক বড় মাপের মানুষ হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লার বাণী, "এবং যা কিছু তোমরা খরচ কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন, এবং যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না' (সূরা বাকারা : ২৭১)। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এক জায়গায় বলেছেন, 'ধন কুরবানী একটি ইবাদত। তাই প্রতি মাসেই কিছু কিছু করে যেন আল্লাহ্‌র ধর্মের সেবার জন্য খরচ করা যায়। "প্রতিটি বিষয়ে খোদার আনুগত্য কর, আর প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে এ জামা'তের সদস্য মনে করে, তার জন্য প্রথম কাজ হল, সে যেন এ জামা'তের খেদমতে নিজের সম্পদ থেকে কিছু দেয়। যে ব্যক্তি এক পয়সা দেয়ার সামর্থ্য রাখে, সে জামা'তের খরচের জন্য প্রতি মাসে এক পয়সা দিবে। আর যে ব্যক্তি এক টাকার সামর্থ্য রাখে, সে যেন মাসওয়ারী এক টাকা আদায় করে দেয়' [রূহানী খাযায়েন, ৯ম খন্ড, ৮৩ পৃঃ কিশতিয়ে নূহ অংশে]। ইসলামের এই মহান-যুগে ও মহান কাজে অনুসারীদের ধন-সম্পদ কুরবানীকে আল্লাহ্ তা'লা বাধ্যতামূলক করেছেন। কেউ যেন মনে না করে যে, এ মাসে ধর্মের জন্য ব্যয় করেছি, আগামীতে আর ব্যয় করতে হবে না। কান খুলে শ্রবণ কর! তোমাদের দেহ যেমন আত্মাবিহীন মৃত, মাছ যেমন পানিশূন্য হলে মৃত, তেমনি তোমরা যারা এই বিশেষ এক যুগ যা আখেরী যুগ এই

যুগে তোমাদের ধর্মকে তখনই কবুল করা হবে, যখন প্রমাণ হবে যে, তোমরা তোমাদের ধন দিয়ে আল্লাহ্‌র ধর্মসেবা করাকে বাধ্যতামূলক করেছিলে। ধর্মের জন্য ধনের কুরবানী জীবনের সঞ্চালনের সংগে সম্পর্ক রাখে। প্রাণবিহীন প্রাণী আর ধন ধর্মের জন্য খরচ বিহীন মু'মিন, উভয়েই সমান। এ যুগে কুরআনের এই সুমহান হেকমতকে হাতছাড়া হতে দিও না। আজ জামা'তে আহমদীয়া ইসলাম ধর্মের সেবা তো রাতদিন করে, কাজেই আর অবহেলিত আফ্রিকান জাতির জন্য সেবামূলক অনেক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের খেদমত করা হচ্ছে। ধর্মের জন্য ভালবাসা তো খোদা তা'লা কবুল করবেন, এটাতো খোদার কথা। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহ্‌র ভালবাসায় তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা রাখে, আর নিজ ধন দিয়ে কুরবানী করার মাধ্যমে সেবা করা হয়, তাকেও খোদা তা'লা চিরস্মরণীয় করে রাখেন।

যেমন আগরার তাজমহল বাদশাহ্‌ শাহজাহান তার সহধর্মিনী মমতাজের প্রতি ভালবাসার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ নির্মাণ করে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন। এখানে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা প্রথম কাজ করেছিল তারপরে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি ভালবাসায় বাদশাহ্‌ শাহজাহান নিজ ধন হতে খরচ করলেন। পাঠকগণ একটু কি ভেবে দেখবেন? কাল কেয়ামত পর্যন্ত এই সৃষ্টির ও স্রষ্টার হকের কথা স্মরণীয় হয়ে রইবে। হে খোদার মসীহের প্রেমিকগণ! তোমাদেরকে এ ধরাতে এজন্য দাঁড় করানো হয়েছে যে, তোমরা ধর্মের জন্য তোমাদের ধন সম্পদকে উৎসর্গ করবে। তোমরা তৌহিদের প্রতি ভালবাসাকে এবং খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি ভালবাসাকে দুনিয়ার সকল কিছুর মুকাবেলায় প্রাধান্য দিবে। তোমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা দুনিয়াতে ধর্ম জীবন ফিরে পাবে। তোমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা ইসলাম ধর্ম সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয় লাভ করবে, তোমাদের কুরবানী দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সবচাইতে বড় এক নবী (সা.) এর সঠিক পরিচয় জগদ্বাসী জানতে পারবে, তোমাদের ধন কুরবানী দ্বারা জগত থেকে ত্রিত্ববাদীদের অবসান ঘটে একত্ববাদের নতুন আসমান, নতুন জমিন তৈরী হবে, তোমাদের মাল কুরবানী দ্বারা ইসলাম ধর্মের শত্রু, কলমবাজদের বিরুদ্ধে দলিল দাঁড় করে নিস্তব্ধ করে দিতে হবে, তোমাদের ধনের কুরবানী দ্বারা সমস্ত জগতে ইসলাম ধর্মের জন্য বড় বড় উপাসনালয় (মসজিদ) নির্মাণ করা হবে। তাহলে চিন্তা করুন, আগ্রাতে একজন বাদশাহ শাহজাহানের কথা নয়, এখানে অগণিত শাহজাহানের স্মৃতি-চিহ্ন তৈরী হবে, আর তা হবে খোদা ও তার প্রিয় রাসূল (সা.)-এর জন্য।

আল্লাহ্‌ তা'লার বাণী, "যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকা দান কর, তাহলে এটাও খুব ভাল এবং যদি তা গোপনে দান কর এবং তা দরিদ্রগণকে দাও, তাহলে এটা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর এবং তিনি (এর কারণে) তোমাদের অনেক অনিষ্ট তোমাদের নিকট হতে দূর করে দিবেন এবং তোমরা যা কর তা সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত আছেন। (সূরা বাকারা: ২৭২) এই আয়াতেও কত জোরালোভাবে আল্লাহ্‌র ধর্মের সেবার জন্য ধন-সম্পদ খরচ করার কথা বলা হয়েছে। প্রকাশ্যে দান করার অর্থ হল নিজে অন্যের প্রেরণার কারণ ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হিসাবে দাঁড় হওয়া। গোপনে দান করাকে দান গ্রহিতার যেন কোনক্রমেই আত্মসম্মান বোধে আঘাত না লাগে। গোপনে দানকে এজন্য উৎসাহিত করা হয়েছে যেন দাতার অহংকার থেকে আত্মরক্ষা হয়। ইসলাম ধর্মে সদকাকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এর দ্বারা দাতা যেমন বিপদের সমূহ সম্ভাবনা থেকে মুক্তি ও দোয়া কবুল এবং সকল অনিষ্ট দূরীভূত হয় অপর দিকে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের জন্য আল্লাহ্‌ কর্তৃক জারিকৃত এক বৈধ ও উত্তম রিয্‌ক বা অর্থের ব্যবস্থাসম্পন্ন হয়ে যায়। ইসলাম ধর্মে যে কোন ধরনের অর্থের ব্যবস্থাপনাই হউক না কেন তা দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সম্মান ও কল্যাণ পুরস্কারের ব্যবস্থাকে অতি উত্তম বা উৎকৃষ্টাকারে পেশ করা হয়েছে। দাতা ও গ্রহীতা ইসলামের আদেশের মধ্যে থেকেই তাদের স্ব স্ব চাহিদা হতে পারে, দু'ধরনের তা পূর্ণ করেছেন। যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেন, "এর থেকে একটি শিক্ষা তথা মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যায় যে, তকদীরকে আল্লাহ্‌ বদলে দেন এবং কান্নাকাটি ও সদকা-খয়রাত অপরাধের আইনানুগ প্রদত্ত শাস্তির ফরমানকেও নিষ্ক্রিয় করে দেয়। সদকা-খয়রাতের মূলনীতি এথেকেই উদ্ভুত। এই সকল পন্থা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত। তা'বীর রুইয়া বা স্বপ্ন তত্ব বিশ্লেষণমূলক শাস্ত্রে মাল দ্বারা 'কলিজাকে' বুঝায়। সেজন্য খয়রাত করা প্রাণ দেওয়ার (তথা কলিজা ছিঁড়ে দেওয়া) তুল্য।

মানুষ দান-খয়রাতের সময় কতই না নিষ্ঠা ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দেয়। আসল কথা তো এ-ই যে, কেবল কথায় চিঁড়ে ভিজে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমলের ধারায় কার্যকর করে কোন বিষয়কে দেখান যায়। 'সদকা' এটাকে এজন্য বলা হয় যে, সাদেকগণকে বা নিষ্ঠাবানদেরকে সদকা চিহ্নিত করে থাকে।" (মলফুজাত, ১ম খন্ড, নতুন সংস্করণ, পৃ: ১৫৫)। সদকা খয়রাত করাতো নবী করীম (সা.)-এর দৈনিকের এক নীতি বলে আমরা জানতে পারি। এ কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'লার সৃষ্টির মঙ্গল সাধিত হয়। এ যুগের মামুর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর সারা জীবন এই মহান কাজ করে গেছেন। এতে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। অপর দিকে সৃষ্টির প্রতি দয়াপরপশ হয়ে খেদমত করা হয়, আর এতেই আল্লাহ্‌ খুশি।

আল্লাহ্‌ তা'লার বাণী, "তাদিগতে হেদায়াত দেয়ার দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত নয়, বরং আল্লাহ্‌ যাকে হেদায়াত দান করেন। এবং ধন-সম্পদ হতে তোমরা যা খরচ কর তা তোমাদেরই আত্মার কল্যাণের জন্য, কারণ তোমরা শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই খরচ করে থাক, এবং ধন-সম্পদ হতে তোমরা যা কিছু খরচ কর তা তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ফেরৎ দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (সূরা বাকারা : ২৭৩) যেহেতু ইসলাম ধর্ম সকল মানবের জন্য মুক্তির একমাত্র পথ যা আল্লাহ্‌ কর্তৃক ঘোষণাকৃত। মু'মিনদের দায়িত্ব ইসলামের সুমহান বাণী সমস্ত জাতিগুলোর মধ্যে পৌঁছানো।

ইসলাম ধর্ম সত্য ধর্ম, খোদা তা'লার মনোনীত ধর্ম এ বিষয়গুলো জগতের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে। গত ১৪০০ বছর যাবত ইসলাম ধর্মের ওপর যত ধরনের কালিমা লেপিত হয়েছে ইসলাম ধর্মের শত্রু দ্বারা ও ইসলাম ধর্মের ব্যবসায়ীদের দ্বারা তা একত্র করলে একটি লাইব্রেরী দাঁড়াবে আর যত শত্রুতা মূলক প্রকাশনার কাজ হয়েছে তা জমা করলে ক্রোশের পর ক্রোশ লাইব্রেরীতে পরিণত হবে। এ সমস্ত কাজ ইসলামের অনুসারীদের নিকট থেকে যে মালের বা ধন-দৌলতের কুরবানী নেওয়া হবে সেই ধন-দৌলতের সাহায্যে সম্পাদিত হবে। কত মহান কাজ আজ তৌহিদের অনুসারীদের স্কন্ধে অর্পিত, কত মহান গৌরবের কাজ হবে মু'মিনদের অর্থ দ্বারা। ইসলাম ধর্মে সম্পদ খরচকে অনেক মহান করে দেখা হয়েছে,

> ঐ সকল লোক যারা আর্থিক অনটন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে আর্থিক অনটনে রাখেন না।

তার কারণ এই সম্পদ যখন খলীফার হাতে জমা হবে তখন খলীফা প্রত্যেক দেশের জাতীয় মজলিসে শুরার মাধ্যমে পরামর্শ নিয়ে সমস্ত দুনিয়াতে সেই সম্পদ ব্যয় করবে। এই জন্য ইসলাম ধর্মের বিশ্ব ব্যবস্থাকে যারা তাদের ধনসম্পদ দিয়ে জীবন্ত ও শক্তিশালী করার কাজে হাত বাড়াবে তাদের জন্য দুই জগতের পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, "সুতরাং ইহা প্রজ্ঞার কথা যা আঁচলে বেঁধে নিন। ঐ সকল লোক যারা আর্থিক অনটন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে আর্থিক অনটনে রাখেন না। যারা প্রাচুর্যের অবস্থায় খরচ করে তাদের সাথেও আল্লাহ্ তা'লা প্রতিদানমূলক ব্যবহার করেন তাদের প্রতিও দয়া করেন যারা আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে। আর এর বিপরীতে আল্লাহ্ তা'লার তো কোন অভাব-অনটন নেই। এজন্য তিনি অযাচিত ভাবে দান করেন। আর এত দান করেন যে, তা গণনার অতীত হয়ে থাকে।

অভাব অনটনে এই নিয়্যতের সাথে খরচ করবে না যে, অনটন দূর হবে। তবে ইহা ঠিক যে, আল্লাহ্ তা'লা নিজ অঙ্গীকার তো পূর্ণ করবেন, তিনি প্রতিদানও দিবেন এবং অধিকহারে দিবেন। যদি আপনারা এরূপ করেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লা ইহকালেও আপনাদের অবস্থা পরিবর্তন করবেন এবং আখেরাতেও আপনাদিগতে এমন প্রতিদান দিবেন যার কল্পনাও আপনারা করতে পারবেন না। (জুমুআর খুতবা, ২২ মে ১৯৯৮ইং)

ইসলাম ধর্ম দুনিয়াতে আগমন করেছে কত মহান উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা নিয়ে তা এই সমস্ত বাণী থেকে অতি সহজে অনুমেয়। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত যত নবীগণ (আলইহেমুস সালাম) আগমন করে সমসাময়িক স্ব স্ব নবীর জাতির যোগ্যতা অনুযায়ী আসমানী খোদা তাঁদের নিকট বাণী প্রেরণ করে আল্লহ্ তা'লা তাঁর তৌহিদকে বুঝিয়েছেন এবং ঐ সমস্ত নবীর অনুসারীগণ তাদের জান-মাল দিয়ে সেই নবীর জামা'তের সেবা করার জন্যইতো আজ পৃথিবীতে পরিপূর্ণ ধর্মরূপে ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছে। উক্ত আয়াত মোতাবেক আল্লাহ্ ফেরৎ দিয়েছেন মানবতার ধর্ম ইসলাম, মানবজাতির জন্য প্রেরিত জীবন বিধান আল কুরআনের মত মহান এক কিতাব, আর মানবতার জন্য সবচাইতে দরদী, প্রেমিক, ক্ষমাকারী আল্লাহ্‌র দরবারে সকল নবীদের সুপারিশকারী সকল মানবজাতির জন্য সুপারিশকারী এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর মত একজন মানব রাসূল। প্রত্যেক মু'মিন বান্দা তার ধন থেকে কুরবানী ইসলাম ও মানবতার জন্য করার কারণে তার দ্বীন দুনিয়া পরিপাটি হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'লার বাণী, "(উপরোক্ত দান সমূহ) ঐ অভাবীগণের জন্য যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে (অন্যান্য কাজ হতে) এমনভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে যে, তারা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করতে পারে না। (তারা সাহায্য) চাওয়া হতে বিরত থাকার কারণে অজ্ঞ লোক তাদেরকে ধনী মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের চেহারার লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে তারা মানুষের নিকট নাছোর বান্দা হয়ে কিছু চায় না। এবং তোমরা ধন-সম্পদ হতে যা কিছু খরচ কর, আল্লাহ্ নিশ্চয় উহা সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।" (সূরা বাকারা : ২৭৪)

এই আয়াতে কারীমায় কত মহান বিষয়াবলী সংরক্ষণ করছে, মানব সে যে শ্রেণীরই হউক না কেন তার সম্মানের দিকে নজর রেখে তার সকল চাহিদা পূর্ণ করতে সক্ষম। যুগ যুগ ধরে অভাবী থাকবে, ইসলাম ধর্ম এটা কোন অবস্থাতেই বরদাস্ত করে না। ভিক্ষাবৃত্তি তো ইসলাম ধর্মের জন্য এক বড় ধরনের অপরাধ ও ঘৃণিত কাজ বলে আখ্যা দিয়েছে। ইসলাম ধর্মের সুমহান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেই সমস্ত অভাবী শ্রেণীর মানবতার জন্য ধর্মানুমোদিত অর্থ ব্যবস্থার অধীনে তাদের জন্য কাজ করা হবে। এমন মানুষ ধর্মের আওতাভুক্ত থাকেন যারা সামাজিকতার অনেক ঘোড় প্যাচের কারণে ও তার মান-সম্মানের অনেক ব্যাপার থাকায় চলাচল করতে সমস্যা দেখা দেয়। ইসলাম ধর্মে সকল পর্যায়ের মানুষের সকল ধরনের সমস্যার সমাধান যদি নাই করলো তাহলে কিরূপে এই ধর্ম বা ধর্মীয় গ্রন্থ দাবী করতে পারে যে, এটা সকল মানুষের জীবন বিধান।

সকল ধরণের মানুষের সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ প্রদান করেছে ইসলাম ধর্ম। ইসলামী খেলাফতের অধীনে সম্পদের সুমহান বিশ্ব ব্যবস্থা সকল চাহিদা পুরা করতে বদ্ধপরিকর। হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে রাত্রের অন্ধকারে আটার বস্তা বহন করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। ধর্মীয় ব্যবস্থাপনায় সব সময় মানুষের সকল ধরণের চাহিদা পূর্ণ করেছে। হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সময়ে যখন অভাব-অনটন দেখা দিল তখন মিশরে তাঁরই সুমহান সন্তান হযরত ইউসুফ (আ.) মিশরীয় কোষাগার বা খাদ্যভান্ডার থেকে সেই চাহিদা পুরন করেছে। ইসলাম ধর্মে কখনও দুর্নিতির স্থান নাই।

ইসলামী খেলাফতে সম্পদের এই সুমহান ব্যবস্থা করে মানবতাকে সম্মানিত করেছে, মানবতাকে শান্তির দিকে আহ্বান করেছে। এই মহান ব্যবস্থাপনা দুনিয়ার সকল ব্যবস্থাপনাকে জন্ম দিয়েছে যা মানবতার জন্য করা হয়েছে, মানুষের অধিকারের জন্য করা হয়েছে, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'লার বাণী, 'যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাত্রে এবং দিবসে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে এবং তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না' (সূরা বাকারা :

২৭৫)।

ধর্ম যখন দুনিয়াতে আগমন করে তখন দরিদ্রতার পোষাকে প্রবেশ করে, আর প্রাথমিক যুগে যারা সেই ধর্ম বা মহামানবকে গ্রহণ করেন তারাও দরিদ্রই হয়ে থাকেন। দরিদ্রতার মধ্যেও ধর্মের জন্য অর্থ কুরবানী করে থাকে। ইবাদতের ব্যাপারে যেমন বলা হয়েছে, ক্লান্ত থাকলে তুমি বসে বসে নামাযকে পূর্ণ কর, শায়িত থাকলে তুমি ইশারায় নামায আদায় কর, কিন্তু নামায ছাড়া যাবে না। তেমনি সামর্থ অনুযায়ী নিয়মিতভাবে মহান আল্লাহ্ তা'লার আদেশ ও সন্তুষ্টিতে অবিরতভাবে মালের কুরবানী করেই যেতে হবে। যে ব্যক্তি দু'রুটির সংগ্রহ করেছে সে এ থেকে কিছু খাবে আর কিছু ধর্মের জন্য পেশ করবে। এই আয়াত মালি কুরবানীর দিকে অতি গুরুত্বারোপ করেছে, অর্থাৎ সকল অবস্থায় কুরবানী করে যেতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের জন্য অর্থ সম্পদ ব্যয় করাতো এ এক সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ যে এক পরম নেয়ামত যা আসমান থেকে ব্যবস্থাপত্র আখেরী যুগে একটি জামা'ত কায়েম হবে, যে জামা'ত তাদের ধন-সম্পদ হতে ধর্মের সেবার জন্য ও মানবতার উত্তম পরিণতির জন্য নিজের কষ্টে অর্জিত সম্পদ হতে আল্লাহ্‌র রস্তায় খরচ করবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "আমি যে বার বার জোর দিয়ে বলি, আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর, এটা আল্লাহ্‌র আদেশের ভিত্তিতেই বলি। কারণ এ সময় ইসলাম অধ:পতনের মুখে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্জগতের দিক থেকে ইসলামের ওপর যে বিপদ তা দেখলে অস্থির হয়ে পরি। ইসলাম বিধর্মীদের আক্রমণের শিকার হয়ে পড়েছে। আজ যখন এ অবস্থা হয়েছে তখন আমরা কি ইসলামের অগ্রগতির জন্য পদক্ষেপ নেব না? আল্লাহ্ এতদুদ্দেশ্যেই তো জামা'তকে কায়েম করেছেন।

সুতরাং এর উন্নতির জন্য চেষ্টা করা আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ইচ্ছা পুরণের চেষ্টা করা। এজন্য তোমরা যা-ই কিছু খরচ করবে আল্লাহ্ তা'লা তা দেখেন, তিনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা। এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র খাতিরে দিবে, আমি তাকে অনেক গুণ বেশি বরকত দিব। ইহজীবনেও অনেক কিছু পাবে, মৃত্যুর পরে পরজগতেও পুরস্কার অবশ্যই সে পাবে এবং দেখবে যে, কত আরাম তাকে দেয়া হবে। অতএব আমি এখন তোমাদের সকলকে বলছি, ইসলামের উন্নতির জন্য তোমরা নিজেদের ধন সম্পদ খরচ কর" (মলফুযাত : ৮ম খন্ড পৃ: ৩৯৩)।

আখেরী যামানায় প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের মাধ্যমে যে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হবে সেই জামা'ত সমস্ত দুনিয়ার মানুষের নিকট ইসলামের সুমহান বাণী স্পষ্ট করে তুলে ধরবে। উক্ত বাণী অনুযায়ী ইসলাম ধর্মের বহি শত্রু ও অভ্যন্তরীণ শত্রু ইসলামের যে ক্ষতি করছে তার সঠিক জবাব দেওয়ার বৃহত কাজ এই জামা'তের ওপর অর্পিত।

ইসলাম ধর্মের খোদা জীবন্ত খোদা, তিনি সদা সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন, তিনি দেখেছেন যে আমি যে ধর্ম সমস্ত দুনিয়ার মানুষের মুক্তির জন্য প্রেরণ করেছি, সেই ধর্মের প্রতি বা ধর্মের আদেশ পালনের প্রতি কোন জাতি বা মানুষ কেমন গুরুত্ব দেয়। খোদা তা'লা কোন সৎকর্মপরায়ণকারীর সৎকর্ম কখনও বিনষ্ট হতে দেন না বরং তার পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করেন যদিও সরিষাদানা পরিমাণ হউক না কেন। এই মহান ধর্ম দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা তাদের জীবন বা ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে বা ধর্ম কায়েমের জন্য ব্যয় করবে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবন ও পরকালের জীবনকে রহমান আল্লাহ্ সকল দিক থেকে কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গাতে।

(চলবে)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা

● কনের বাড়ীতে বিবাহ ভোজ সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, যদি মেয়ে পক্ষের সাধ্য ও সামর্থ থাকে তাহলে সীমিত গন্ডিতে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঋণ করে অন্যের দেখা-দেখি কখনও বড় ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সবকাজে তরবিয়তের দিকটা সামনে রাখা চাই। যাদের আর্থিক সামর্থ নেই তাদের কোনভাবেই হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়।

● মেয়েদের চাকুরী করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, আমি এক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে অনুমতি দেই না। যদি কোন উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে মহিলা চাকুরী করতে পারেন কিন্তু তা-ও করতে হবে পর্দার ভেতর থেকে। কোনভাবেই পর্দার মান পদদলিত হতে দেয়া যাবে না।

● পর্দার শর্ত সাপেক্ষে সহশিক্ষার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে অনুমতি নিতে হবে।

● ফটো সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, বিয়ের জন্য যদি ফটো দিতে হয় দিন কিন্তু পরে তা ফেরত নিতে হবে। পত্রিকায় কোন আহমদী মহিলার ছবি ছাপা ঠিক হবে না।

এ বিষয়গুলো জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যদের অবগতি ও প্রতিপালনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

[সূত্র : জি.এস/আমুজাবা/৭১৮, তারিখ: ২৫/১১/২০০৯]

এক চরম বিদ্বেষীর সত্যের অকপট স্বীকারোক্তি

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর দাওয়াতুল আমীর পুস্তকের ১০৬-১০৭ পৃষ্ঠায় বলেন:

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সম্পর্কে সে- যুগে মানুষ যে-ধরনের মনোভাব পোষণ করত, তদ্‌সংক্রান্ত একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। এটি এমন এক ব্যক্তির লেখায় প্রকাশ পেয়েছে, যে পরে তাঁর চরম বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাঁর দাবীর পর সে-ই সর্বপ্রথম তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া প্রদান করে। এই ব্যক্তি কোনো সামান্য মানুষ নয়; বরং, আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের নেতা ও কর্তা মৌলভী মোহাম্মদ হোসেইন বাটালভী সাহেব, যিনি মির্যা সাহেবের রচিত গ্রন্থ 'বারাহীনে আহমদীয়া' সম্পর্কে পর্যালোচনা লিখতে গিয়ে স্বীয় পত্রিকা 'ইশাআতুস সুন্নাহ্'-তে তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন:

'বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের প্রণেতা মির্যা সাহেবের জীবন-চরিত ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আমরা যতদূর জানি, সমসাময়িক লোকদের মধ্যে এমন মানুষ খুব কমই আছে, যারা এতটা জানে। লেখক এবং আমরা একই অঞ্চলের অধিবাসী; বরং জীবনের শুরু থেকেই (যখন আমরা কুরতুবী এবং শরাহ্ মুল্লাহ্ পড়তাম) তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর এবং আমার মাঝে পত্র-বিনিময়, দেখা-সাক্ষাত ও ভাবের আদান-প্রদান অব্যাহত আছে। তাই, আমাদের একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, আমরা তাঁর অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালভাবেই অবহিত।

আমার মতে এই গ্রন্থ (হযরত সাহেবের গ্রন্থ– বারাহীনে আহমদীয়া- অনুবাদক) এযুগে বিরাজমান পরিস্থিতির নিরিখে এমন এক গ্রন্থ , যার সমতুল্য রচনা ইসলামে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি; আর ভবিষ্যতেও হবে কিনা জানা নেই। لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا (সূরা আত্ তালাক: ২)

এর প্রণেতা প্রাণ-সম্পদ, রচনাবলী ও বক্তৃতাসমূহ তথা স্বীয় পবিত্র-জীবনাচরণের মাধ্যমে ইসলাম-সেবায় এমন অবিচল প্রমাণিত হয়েছেন যে, এর দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী মুসলমানদের মধ্যে অতি বিরল।

আমার এসব কথাকে কেউ প্রাচ্যের অতিরঞ্জন মনে করলে আমাকে অন্তত এমন একটি গ্রন্থের নাম বলে দিক, যাতে ইসলামের সকল বিরোধী-সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে আর্য ও ব্রাহ্ম সমাজের এমন জোরালো খন্ডন থাকবে এবং ইসলামের এমন দু'চারজন সেবকের সন্ধানও দিক, যারা ধন-প্রাণ এবং কথা ও লেখার মাধ্যমে ইসলামের সাহায্যের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেয়া ছাড়াও আদর্শগত ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে ইসলামের পক্ষে দন্ডায়মান হয়েছেন। আর ইসলাম-বিরোধী ও ইলহামে অবিশ্বাসীদেরকে পাল্টা বীরত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে থাকবেন, ইলহাম হওয়া সম্পর্কে যার সন্দেহ রয়েছে– সে আমার কাছে এসে এর অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ করতে পারে; আবার এই অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ-দর্শনের স্বাদ বিজাতীয়দেরকেও আস্বাদন করিয়ে থাকবেন।' (ইশা'আতুস সুন্নাহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ১৬৯-১৭০)

(বাংলা ডেস্ক লন্ডন এর সৌজন্যে)

হযরত ইউনুস (আ.) -এর ধর্মপ্রচার

সংকলন: মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান

হযরত ইউনুস (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.) এর বংশীয় একজন রাসূল ছিলেন। তিনি প্রায় ৯০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে দ্বিতীয় জেরোয়াম অথবা জেজোয়া হাযের রাজত্বকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর জাতিকে বললেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রভু একজন। তিনি আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের অন্তর্গত সবকিছুর প্রতিপালক এবং কিরোণদয় স্থল সমূহেরও প্রতিপালক। নিশ্চয় আল্লাহ্ নিকটবর্তী আকাশকে গ্রহ-নক্ষত্র রাজি সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত করেছেন। তখন তার জাতির লোকেরা তাকে তাড়িয়ে দেয়। তখন তিনি (আ.) বললেন, বিতাড়িত করার জন্য এবং অমান্যকারীদের জন্য চিরস্থায়ী আযাব আছে। (৩৭:৫, ৬,৭, ১০)।

আসলে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বাক্য আকাশে সংরক্ষিত থাকে, ততক্ষণ ইহা অপরের হস্তক্ষেপ হতে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। কিন্তু নবীদের কাছে আল্লাহ্‌র এসব বাণী অবতীর্ণ হওয়ার পরে, শয়তান অথবা নবীর শত্রুরা এর শব্দাবলী ও অর্থের পরিবর্তন করে নবীর প্রতি আরোপ করে থাকে। অথবা তারা অবতীর্ণ কয়েকটি বাক্যের স্থানচ্যুত অবস্থান উদ্ধৃতি করে এদের সাথে মিথ্যা মিশিয়ে পরিবেশন করে। এমনকি নবীর শিক্ষাকে তাদের নিজের শিক্ষা বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এসব মিথ্যা চালাকি ও চতুরতা তখন ধরাপরে যায়, যখন ধর্ম সংস্কারকগণ এসে অবতীর্ণ বাক্যাবলী ও উহার ব্যাখ্যার সঠিকতা নিজেরা ঐশী আলোকে যাচাই করে দেখান।

অতএব তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা বেশী কঠিন অথবা তোমাদের ছাড়া বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি, যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, বেশি কঠিন? নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে আঠালো কর্দম হতে সৃষ্টি করেছেন (৩৭:১২)। তখন তাঁর জাতির লোকেরা তাঁর (আ.) উপদেশ গ্রহণ না করে তারা হাসি-বিদ্রুপ করতে লাগল। (৩৭:১৩-১৪)।

হযরত ইউনুস (আ.) যখন কোন নিদর্শন দেখিয়ে বলতেন, এ দেখ আমার নবুওয়াতের নিদর্শন, আল্লাহ্ আমাকে নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন, আমি যেন তোমাদের সঠিক পথ দেখাই, আর তোমরা যেন এ থেকে হেদায়াত পাও আর উপকৃত হতে পার।

যখন তারা নবীর স্পষ্ট নিদর্শন দেখত, তারা তখন হাসি-বিদ্রুপ করে বলত ইহাতো প্রকাশ্য যাদু বই কিছু নয়। কী! যখন আমরা মরে যাব, মাটি হয়ে যাব এবং অস্তিপঞ্জে পরিণত হব, তখন কি সত্যি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? এবং আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণকেও? (৩৭:১৫-১৮)।

তখন তিনি বললেন, হাঁ, এবং তোমরা তখন লাঞ্ছিত হবে। উহা হবে এক বিরাট গর্জন মাত্র, তখন অকস্মাৎ তোমরা জীবিত হয়ে দেখতে পাবে। এবং তোমরা বলবে, হায়; আমাদের সর্বনাশ! এতো সেই বিচার দিবস। তখন আল্লাহ্ বলবেন, ইহা সেই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলে অস্বীকার করতে (৩৭:১৯-২২)।

তখন আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশতাগণকে আদেশ করবেন যে, তাদেরকে সমবেত কর যারা যুলুম করেছে এবং তাদের সঙ্গীগণকে এবং তাদেরকেও যারা তাদের ইবাদত করত–আল্লাহকে ছেড়ে, সুতরাং তাদের সকলকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাও এবং তথায় তাদেরকে দাঁড় করাও, কেননা তারা জিজ্ঞাসিত হবে।'

তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমাদের কি হয়েছে, এখন তোমরা একে অপরকে সাহায্য করতেছ না? সেইদিন তারা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে (৩৭:২৩-২৭)। কাফেরগণ পরস্পরকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, এ সত্য এখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন তারা পরস্পরকে দোষারোপ করবে।

আর ধর্মযাজকদেরকে বলবে, তোমরা ধর্মের মিথ্যা দোহাই দিয়ে আমাদেরকে ভুলিয়েছিলে। তখন কাফেরগণের নেতা বলবে, তোমরা নিজেরা আমাদের অনুগমন করছিলে–আমরা বিপদগামী ও ভ্রান্ত ছিলাম। অতএব আমাদের কাছ হতে এর চেয়ে ভাল আর কীবা আশা করতে পার। ইহা যেন এক অন্ধ আর অন্য অন্ধকে রাস্তা দেখিয়েছে, সে রকম।

সেদিন তারা সকলেই শাস্তির মধ্যে অংশীদার হবে। আল্লাহ্ তা'লা অপরাধীদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করে থাকেন। কারণ যখন তাদেরকে বলা হত, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই, তখন তারা অহংকার করত, এবং তারা বলত, আমরা কি একজন পাগল

কবির জন্য আমাদের মাবুদদেরকে পরিত্যাগ করব? বরং তিনি সত্য নিয়ে এসেছিলেন (৩৭:২৩-৩৮)।

তিনি (আ.) বললেন, হে অস্বীকারকারীগণ! নিশ্চয় তোমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে এবং তোমরা যা কিছু করতেছ তোমাদেরকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হবে।

শুধু আল্লাহ্‌র বিশেষ মনোনীত বান্দাগণ ছাড়া যে আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনে আর আমার আনুগত্য করে তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিযক–ফল, ফলাদি এবং তারা পরম সম্মানিত বলে গণ্য হবে। তারা নেয়ামতপূর্ণ বাগানে থাকবে, আর তারা পালঙ্কে পরস্পর মুখামুখী হয়ে বসবে, ঝরণার পানি দ্বারা পরিপূর্ণ পান-পাত্র তাদের সামনে পরিবেশিত হবে, যা স্বচ্ছ-শুভ্র হবে, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু হবে, এতে কোন মাদকতা থাকবে না এবং এর ব্যবহারে তারা মাতালও হবে না (৩৭:৩৯-৪৮)।

মানুষ কত বড় ভাগ্যবান যে, সে মৃত্যুর পর বেহেশতের অধিবাসী হয়ে অমর জীবনের অধিকারী হয়। ইহজগত হতে বিদায় নিবার পর আর সে মৃত্যুবরণ করবে না। আমরত্বের পথে তার যাত্রার না আছে বিরতি, না আছে শেষ, মহান সফলতার অমর জীবনের সুখভোগ এবং আবহমানকাল ধরে নিরবিচ্ছন্ন ধারায় তৃপ্তি লাভ ও আধ্যাত্মিক মনোস্কামনা সিদ্ধির মাঝে মানুষ চরম সফলতা ও বিজয়কে উপভোগ করে।

প্রত্যেক পাপ বিষ বিশেষ। অবিশ্বাসের বিষবৃক্ষের অভিশপ্ত ফল খাওয়ার অপরাধ মানুষকে দোযখের অতল গর্বে নিক্ষেপ করে। মানুষ সাধারণত: পুরাতন রীতিনীতি, সংস্কার ও প্রচলনের দাস হয়ে থাকে। প্রচলিত প্রথা ও ধ্যান-ধারণার অবসান ঘটানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কুরআনে এ কথা বার বার বলা হয়েছে যে, নতুন ধ্যান-ধারণার প্রতি অনিহা মানুষের সত্য গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত ইউনুস (আ.) এর জাতির লোকেরা ফিরিশতাগণকে আল্লাহ্‌র শক্তির অধিকারী বলে মনে করত এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে গণ্য করত।

হযরত ইউনুস (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রতিপালকের জন্য কি কন্যাগণ আর তাদের জন্য পুত্রগণ? আল্লাহ্ কি ফিরিশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করছেন এবং তোমরা কি এর সাক্ষী ছিলে?

তিনি (আ.) বললেন, শুন! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের মনগড়া মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে বলতেছ, সন্তান জন্ম দিয়েছেন; বস্তুত: তোমরা চরম মিথ্যাবাদী। তিনি কি পুত্রগণের পরিবর্তে কন্যাগণ বেছে নিয়েছেন? তোমাদের কি হচ্ছে? তোমরা কিরূপ বিচার কর? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? তোমাদের নিকট কি কোন স্পষ্ট দলিল প্রমাণ আছে?

সুতরাং তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তা হলে তোমরা তোমাদের কিতাব পেশ কর (৩৭:১৫৭-১৫৮)। কোন ঐশী কিতাবে ঘৃণাক্ষরে এরূপ নির্বোধ ও জঘন্য মত পোষণ করা হয়নি।

কাফেররা মনে করত যে, তাদের মত একই ধ্যান ধারণার অর্থাৎ নবী এবং তার অনুসারী লোকদেরকে ভুত-প্রেতরা পথ ভ্রষ্ট করতে পারে। কিন্তু তারা ধর্ম পরায়ণ লোকদের ওপর কর্তৃত্ব বা প্রভাব ঘটাতে পারে না। মু'মিনগণ সকলেই সর্বদায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করে থাকে। নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রাপ্ত হয়। যুগে যুগে আল্লাহ্ এবং তার পবিত্র বান্দাগণ নিশ্চয় বিজয়ী হয়ে থাকেন।

তাঁর জাতি তৌহিদের আহ্বানে সাড়া না দেওয়াতে তাঁর জাতির এক গুঁয়েমী তাঁকে ক্রোধান্বিত করছিল। তখন তিনি রাগ করে তাঁর জাতির নিকট হতে চলে গিয়েছিলেন এবং ধারণা করছিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে কখনও পাকড়াও করবেন না বা কোন দুঃখকষ্ট বা বিপদ নির্ধারিত করবেন না।

এবং তিনি (আ.) এক বোঝাই নৌকায় উঠে পালাতে ছিলেন (৩৭:১৪১) তখন এক তুফান এসে নৌকা সমুদ্রে নিমজ্জিত হবার আশঙ্কা দেখা দিল, তখন তিনি অন্যান্য আরোহীগণের সঙ্গে ভাগ্য-নির্দেশক তীর নিক্ষেপ করল, ফলে সে পরাজিত হয়ে সমুদ্রে নিক্ষিপ্তগণের হয়ে গেল (৩৭:১৪২)।

তখন এক বৃহৎ মৎস তাকে গিলে ফেলল এবং তিনি নিজেকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন (৩৭:১৪৩) তিনি কঠিন বিপদাবলীর অন্ধকার রাশির মধ্যে হতে আল্লাহ্‌কে ডাক দিলেন এবং বললেন, "আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা, ইন্নী কুন্তু মিনায্‌যালিমীন"। হে আমার প্রভু! তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই; তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম (২১: ৮৮)। তখন আল্লাহ্ তাঁর দোয়া শুনেছিলেন এবং তাঁকে দুঃখ-কষ্ট হতে নাজাত দিয়েছিলেন এবং এভাবে আল্লাহ্ মু'মিনগণকে উদ্ধার করে থাকেন (২১:৮৯)। আল্লাহ্ বললেন, "লান নাকদিরা আলাইহি" আমরা তাঁকে পাকড়াও করব না' তার জন্য আমরা কোন দুঃখ কষ্ট বা বিপদ নির্ধারিত করব না।"

এবং তিনি যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতেন (৩৭:১৪৪)। তাহলে তিনি অবশ্যই এর উদরে সেই দিবস পর্যন্ত পড়ে থাকতেন যখন মানবজাতি পুনরুত্থিত হবে (৩৭:১৪৫)। আল্লাহ্ তাঁকে এক উন্মুক্ত ময়দানে নিক্ষিপ্ত করেছিলেন এমতাবস্থায় যে, তিনি এমন পীড়িত ছিলেন (৩৭:১৪৬)। তার সমস্ত শরীর শৈত কুষ্ট হয়ে গেল, তখন আল্লাহ্ তাঁর নিকট একটি লাউগাছ উদগত করেছিলেন (৩৭:১৪৭)। যেন লাউ খেয়ে তিনি (আ.) শরীরের সৈত কষ্ট পীড়া দূর করে আরোগ্য লাভ করতে পারেন।

এবং আল্লাহ্ তাঁকে একলক্ষ তা ততোধিক লোকের নিকট রসূলরূপে পাঠিয়ে ছিলেন (৩৭:১৪৮)। সুতরাং তারা সকলেই ঈমান এনেছিল এবং তাদেরকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পার্থিব সুখ-সম্পদ দান করেছিলেন (৩৭:১৪৯)।

অতএব, হযরত ইউনুস (আ.) এর সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন জনপদ কেন এমন হয় না যারা সকলেই ঈমান আনবে এবং তাদের ঈমান তাদেরকে উপকৃত করবে? যখন তারা সকলেই ঈমান এনেছিল তখন আল্লাহ্ তাদের ওপর হতে পার্থিব জীবনের লাঞ্চনা জনক শাস্তি দূরীভূত করেছিলেন এবং তাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য সর্বপ্রকার সুখ সম্ভোগের উপকরণ দিয়েছিলেন (১০:৯৯)

(বাংলায় অনুদিত কুরআন করীমের আলোকে)

প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(শেষ কিস্তি)

মোহাম্মদ ওসমান গনি

স্বজনদের স্মৃতিকথা

মোহাম্মদ ওসমান গনি শহীদের মুকুট লাভ করেছেন আজ অর্ধশতাব্দী পূর্ণ হল। এত বছর পূর্বে তিনি কেমন মানুষ ছিলেন এবং সমাজে মানুষের জন্য কি করেছেন, সেই শিকড়ের সন্ধানে এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও থেকে আমরা ক'জন ২৬ মে ২০১২ তারিখ তাঁর জন্মভূমি মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানার ধুল্ল্যা গ্রামে ছুটে যাই। তাঁর জীবনালেখ্যের উপর প্রমাণ্য চিত্রের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। তখন আত্মীয়-স্বজন তাঁর স্মৃতি তর্পনে আবেগাপ্লুত হয়ে কথা বলেন। সকলেই একবাক্যে বলেন–এমন ভালো মানুষ আমরা কখনো দেখি নাই। নিম্নে তাঁর স্বজনদের স্মৃতি কথা উল্লেখ করা হলো :–

১। শহীদ ওসমান গনির ছোটবোন সুফিয়া বেগম বলেন–

আমার বড় ভাই শহীদ ওসমান গনি। তিনি বাল্যকাল থেকেই পরোপকারী ছিলেন। আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের সেবাব্রতে কাজ করেছেন। পাড়া-প্রতিবেশীসহ গ্রামের সকলের আপনজন ছিলেন। ১৯৬৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত ইজতেমা ও জলসায় যাবার সময় আমি তাঁকে রুটি ও হালুয়া পাক করে দেই। তখন জিজ্ঞাসা করি আপনি কবে আসবেন। তিনি আমাকে আদর করে বলেন– আগামী মঙ্গলবার চলে আসবো (ইনশাআল্লাহ্)।

এই মঙ্গলবারই তাঁর পরলোকগমন হয়। আমাদের বাড়িতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে একটি এবং ঢাকা থেকে একটি টেলিগ্রামে মৃত্যুর সংবাদটি পৌঁছে। তখন আমার পিতামাতাসহ বাড়িতে কান্নার রুল পরে। মা পাগল প্রায় হয়ে যায়। সারা গ্রাম জুড়ে শোকের ছাঁয়া নেমে আসে। আমার পিতা আমার মামাকে নিয়ে ঢাকার বকশীবাজার আঞ্জুমানে চলে যান। কিন্তু সেই সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবার কোন সুবিধা ছিল না বিদায় ভাইজানের মরদেহ দেখা সম্ভব হয়নি। পরে আমরা সবাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়ে তাঁর কবর দেখি এবং জিয়ারত করি। আমি খুবই গর্বিত আমার বড় ভাই প্রথম বাঙালি শহীদ। আর আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ১৯৬৪ সালে বিবাহ হয়। জামা'তের বিভিন্ন জনের কাছে আমি শহীদ ওসমান গনির বোন হিসেবে পরিচিত।

শহীদ ভাইজান আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমাদের বাড়িতে পাক্ষিক আহমদী আসতো। তিনি আমাকে পড়তে দিতেন। আমাকে বাংলা নযম শিখাতেন। তিনি শহীদ হওয়ার পর আমার পিতামাতা এবং আমরা দুই বোন বয়আত করে আহমদী হই। আমার মা বয়আত নিয়েছিলেন মাওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সদর মুরব্বীর হাতে এবং আমার বড় বোন ময়মনসিংহ গিয়ে আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের হাতে বয়আত নেন। মৌলবি সলিমুল্লাহ সাহেবের রচিত 'শহীদী গজল' নযমটি আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পাঠ করি। এখনও এ নযমটি পাঠে আমার চোখে পানি আসে। আল্লাহ্ তা'লা আমার ভাইকে শহীদের উচ্চ মোকাম দান করুন, আমীন।

২। গনি সাহেবের চাচাতো ভাই মোহাম্মদ মাহবুব আলম বলেন–

শহীদ ওসমান গনি বয়সে আমার কয়েক বছরের বড় ছিলেন। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। বাড়িতে সকল ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়ার জন্য তাগিদ দিতেন। আর্মিতে চাকুরি করা কালে বাড়ি আসলে পাড়া-প্রতিবেশী, এমনকি গ্রামবাসীরা কে কেমন আছে, ছেলে-মেয়েরা কে কি করে, কারও লেখাপড়ায় অসুবিধা আছে কি না খোঁজ খবর নিতেন। তাঁর শহীদ হওয়ার পর সকলের মনে একই প্রশ্ন জাগে হায়! এমন ভালো মানুষটিকে কেন মারা হল।

তিনি একজন উত্তম সমাজ সেবক ছিলেন। নিজে উদ্যোগী হয়ে আমাদের গ্রামের ৪/৫ জন লোককে আর্মিতে চাকুরী ব্যবস্থা করেন। কোন বয়স্ক লোক রাস্তায় বোঝা বহনের সময় অসুবিধা হলে নিজ মাথায় নিয়ে বহন করে দিতেন। কোন মহিলার ছোট বাচ্চা কোলে নিয়ে হাটতে অসুবিধা দেখলে নিজে কোলে নিয়ে পৌঁছে দিতেন। কখনো এ কাজের জন্য আমাদেরকে বলতেন। আমরা তাঁর স্নেহাদেশ পালন করতাম। তিনি আহমদী

হওয়াতে অনেকে তার প্রতি বিরূপ ধারনা পোষণ করলেও তাঁর আচার ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। সবাই একবাক্যে বলতেন তিনি একজন আদর্শবান সৎ মানুষ। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে গ্রামে কিছু করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এটা করা হয়নি। তবে আহমদীয়া জামা'ত থেকে তার স্মৃতি রক্ষার্থে যদি কিছু একটা করা হতো আমরা খুশী হতাম। আমাদের বংশধররা তাঁকে জানতে পারতো।

৩। ওসমান গনির চাচাতো ভাই মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বলেন–

গনি ভাই আমার তিন / চার বছরের বড় ছিলেন। আমাকে তিনি সর্বদা লেখাপড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি স্কুলে যাবার সময় আমাকে সাথে নিয়ে যেতেন। তাঁর সাথে বিকালে খেলাধূলা করতাম। তাঁর স্বভাব চরিত্র পানি মতো সরল ছিল। পানিতে যেমন কোন দোষ নেই, তেমনি তাঁর মাঝে কোন দোষত্রুটি ছিল না। এলাকায় তাঁর কোন শত্রু ছিল না। তবে আহমদী হবার কারণে মাওলানাদের ফতোয়ায় বিভিন্ন জন নানা ভাবে অত্যাচার ও নিপীড়ন করেছে। কিন্তু তিনি এটা হাসি মুখে বরণ করে নেন। একজন ভাল মানুষের গুণাবলী তাঁর মাঝে ভরপুর ছিল।

৪। শহীদ ওসমান গনির ভাতিজা মোহাম্মদ বদর উদ্দিন বলেন–

আমার শ্রদ্ধাভাজন চাচা ছিলেন গনি সাহেব। তিনি তাঁর কর্মস্থল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাড়ি আসলে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের খোঁজ খবর নিতেন। চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর নারায়ণগঞ্জে একটি মুদীর দোকান দিয়েছিলেন। সেই দোকানে আমাকে নিয়ে যান। আমি দোকানে ছয় মাসের মত ব্যবসার কাজ করি। পরে তাঁর সাথে বাড়ি চলে আসি। কিছুদিন পর তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জলসায় চলে যান। সেখানে শহীদ হন। তাঁর কথা মনে হলে অনেক কষ্ট পাই। তাঁর মতো পরোপকারী আর দেখি না। তিনি নি:স্বার্থে মানুষের সেবা করেছেন।

৫। শহীদ ওসমান গনির ভাতিজা মোহাম্মদ আজিজুর রহমান বলেন–

আমার চাচা শহীদ হওয়ার সময় আমি দশ বছরের বালক। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমাকে বাল্য শিক্ষা বই পড়াতেন। গ্রামের মুরব্বীদেরকে ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর জন্য পরামর্শ দিতেন। চাকুরি থেকে ছুটিতে বাড়ি আসলে সারা ধুল্ল্যা গ্রাম ঘুড়ে মানুষের খোঁজ খবর নিতেন। কোন ছেলের লেখাপড়ার অসুবিধা দেখলে নিজেই বই খাতা কিনে দিতেন। কেউ পড়া ফাঁকি দিলে তাকে কড়া শাসন করতেন। আমি লেখাপড়ার জন্য তাঁর হাতে মার খেয়েছি। তিনি আমাকে একটি সিলেট পেনসিল কিনে দিয়ে ছিলেন। এটা আমি তাঁর স্মৃতিস্বরূপ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করি। কিন্তু ১৯৮৮ সালে বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে।

তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি যখন আমাদের বাড়িতে পৌঁছে তখন সারা গ্রাম জুড়ে যেন কিয়ামত নেমে আসে। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেই ভারাক্রান্ত ও শোকাহত হয়ে পড়ে। সবার মনে একই প্রশ্ন এমন ভালো মানুষটিকে কেন মারা হলো। সেদিন মনে হয় ধুল্ল্যা গ্রামের পশু-পাখী এবং গাছ-পালাও শোকাভিভূত হয়েছিল। আমি আমার ষাট বছর বয়সে অনেক স্থানে গিয়েছি। অনেক মানুষের সাথে মিশেছি। কিন্তু আমার চাচা গনি সাহেবের মতো কোন মানুষ দেখি নাই। এমন জনদরদী ও সমাজ সেবকের উদাহরণ নেই।

৬। শহীদ ওসমান গনির ভাবী জমিলা বেগম স্মৃতিচারণে বলেন–

আমি এ বাড়িতে বউ হয়ে আসার পর আমার প্রতি তাঁর আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। একজন ভাল মানুষের সকল গুণাবলী তাঁর মাঝে পরিস্ফুটিত হয়। তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি যখন বাড়িতে পৌঁছে তখন তাঁর মাতাপিতা দাঁড়ানো থেকে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। আমি ধরাধরি করে শুয়াবার ব্যবস্থা করি। অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুর সংবাদটি এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পরে। মানুষ দলে দলে বাড়িতে এসে জড়ো হয়। কেউ তাঁর মরদেহ দেখতে না পেলেও বাড়ি এসে শেষ শ্রদ্ধা জানান। চোখের পানি মুছেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আফসোস করেন। তখন শোকে কয়েকদিন পর্যন্ত বাড়িতে খাবার পাক হয়নি। যেন আমাদের উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি শুনে অদূরে মন্দিরে পূজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং পূজারীরা আমাদের বাড়িতে ছুটে আসেন। ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বাংলাদেশের রূপ সৌন্দর্যের মোহে বাংলার কবি মনের আনন্দে যেমন গেয়েছেন–

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।

তেমনি শহীদ ওসমান গনির স্মরণে আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি–

এমন মানুষটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল শহীদের সেরা সে যে আমাদের ওসমান গনি।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'তে প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**।

আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"ইসলামে হজ্জের গুরুত্ব"

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে। লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com

সংবাদ

উথলী আনসারুল্লাহর স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২১/০৬/২০১৩ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ৯ ঘটিকার সময় ১৫তম ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব সালাহ উদ্দিন, জেলা নাযেম, চুয়াডাঙ্গা। প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মেরাজ আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব আমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে খাকসার স্বাগত বক্তৃতা প্রদান করি। নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম। সভাপতি স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল হায়াত, ইজতেমার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে ইজতেমার উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেযা হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রাক্তন রিজিওনাল নাযেম জনাব আব্দুল গফুর। সভাপতির সমাপনি বক্তৃতা ও নযম পাঠের পর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান

নওমোবাঈন সম্মেলন ও তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২১/০৬/২০১৩ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলীতে জনাব মোহাম্মদ আবুল হায়াত বিশ্বাস প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শাহিনুর রহমান, স্বরচিত নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ সদর আলী।

এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করে জামা'তের সাথে যুক্ত থাকার গুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করা হয়। নওমোবাইন ও মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর কুরআন হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে প্রদান করেন মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু, মোয়াল্লেম। ১ জনের বয়আত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মুয়াযযেম আহমদ সানী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের ৪১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৫শে জুন লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে ৪১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর মোহতরম মোনেম বিল্লাহ্, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্র হতে আগত মেহমান মরিয়ম সুলতানা, নায়েব সদর-২ এবং সেহলা সুরহিয়া, মুয়াবিন সদর-১।

কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর আহাদনামা পাঠ করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট রওশন আরা আহমদ। এরপর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তাগণ বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যের বিষয়গুলো ছিল–গিবত ও হিংসা আমল ধ্বংসকারী দাবানল, চট্টগ্রামে আহমদীয়াত, নামাযের গুরুত্ব, স্বাস্থ্যকথা, বিয়ে-শাদী ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে সামাজিক কদাচার পরিহার ও ওসীয়্যতের গুরুত্ব। এছাড়াও লাজনা ও নাসেরাত বোনদের কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ইজতেমার বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত ইজতেমায় ১৪০ জন লাজনা, ৪০ জন নাসেরাত এবং ৮ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

তালাত মেহতাব রত্না

৪২তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমায় যোগদান ও দোয়ার আহ্বান

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪২তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা আগামী ২৭, ২৮ ও ২৯শে সেপ্টেম্বর রোজ শুক্র, শনি ও রাবিবার অনুষ্ঠানের সদয় অনুমোদন দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। আপনারা অবগত আছেন যে, এ বছর খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করছে। এবারের ইজতেমা আকর্ষণীয় ও স্মরণীয় করার জন্য বিভিন্ন দেশের সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া-কে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আশা করি তাদের অংশগ্রহণে এবারের ইজতেমা অনেক বেশী জৌলুষপূর্ণ হবে। সকল খোদ্দাম ও আতফালকে এ মহতী ইজতেমায় যোগদানের আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

মনোয়ার হোসেন
নাযেম আলা
৪২তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৩

ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ও ঈদ মুবারক। পবিত্র ঈদুল ফিতর সকলের জন্য বয়ে আনুক অশেষ কল্যাণ ও বরকত।

–সম্পাদক

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং
আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

New Vol. No. 76 | 3rd Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15th August, 2013 Tk. 24.00

Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১

নীচ তলা

রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২

ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,

০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)

(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)

ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com